বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

ধর্ম্মতত্ত্ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্তৃক
প্রকাশিত

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

মূল্য দেড় টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক
মুদ্রিত

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের (১৩৪৭) ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

> বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব'।

এই 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে গুরুর মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

> অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব ?" "লইয়া কি করিতে হয় ?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। "জীবন লইয়া কি করিব ?" এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল ; এই এক মাত্র সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এতদিনে পাইয়াছি।—পৃ. ৬৮-৬৯।

'ধর্ম্মতত্ত্বে'র বিষয় পুরাতন কিন্তু ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি নূতন। ইহার জবাবদিহিস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

> আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, যাহা আর্য্য ঋষিগণ জানিতেন না—আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম সে ভাষায়, সে কথায়, তাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝান নাই। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক—উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য।—পৃ. ৬৯।

১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত মাসিক পত্র 'নবজীবন' প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা"।

ইহাই ধর্ম্মতত্ত্বের আদি। ১২৯৫ সালে "ধর্ম্মতত্ত্ব" যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, প্রথম প্রবন্ধ "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা"টিই তখন বিভক্ত এবং স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রথমাধ্যায় ক ও খ হিসাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৯১ সালের শ্রাবণ হইতে ১২৯২ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র 'নবজীবনে' বিবিধ প্রবন্ধে ধারাবাহিক ভাবে (মাঝে মাঝে দুই এক মাস বাদ দিয়া) অনুশীলন ধর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা করেন। প্রবন্ধগুলির নাম ও প্রকাশক্রম এইরূপ—

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা	শ্রাবণ	১২৯১, পৃ. ৬-২৩
মনুষ্যত্ব	ভাদ্র	" পৃ. ৭৬-৮৫
অনুশীলন	আশ্বিন	" পৃ. ১৩৭-১৪৯
সুখ	কার্ত্তিক	" পৃ. ২৩৮-২৫২
ভক্তি	মাঘ	" পৃ. ৪১০-৪২০
ঐ	বৈশাখ	১২৯২, পৃ. ৫৯৭-৬০৫
ঐ	আষাঢ়	" পৃ. ৭৩৭-৭৪৯
ঐ	শ্রাবণ	" পৃ. ১-১০
ঐ	ভাদ্র	" পৃ. ৯৩-১০৫
ঐ	আশ্বিন	" পৃ. ১৪৬-১৫৪
প্রীতি	অগ্রহায়ণ	" পৃ. ২৭৩-২৮১
দয়া	চৈত্র	" পৃ. ৫৫৫-৫৬০

১২৯৫ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিকেই ভাঙিয়া চুরিয়া এবং কয়েকটি নূতন প্রবন্ধ যোগ করিয়া 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন। ইহাতেই অনুমান হয় তাঁহার বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত হয় নাই, আরও কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ॥/০ + ৩৫৯। আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

> ধর্ম্মতত্ত্ব। / প্রথম ভাগ। / অনুশীলন। / শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / প্রণীত। / কলিকাতা / শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / ৫নং প্রতাপ চাটুর্য্যের লেন। / ১২৯৫। / মূল্য ১৷০ টাকা। /

'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম সংস্করণের "বিজ্ঞাপন" ও দ্বিতীয় সংস্করণের "উপক্রমণিকা"য় 'ধর্ম্মতত্ত্ব' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

> ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আনুপূর্ব্বিক সাধারণকে বুঝাইতে পারি, এমন সম্ভাবনা অল্পই। কেন না কথা অনেক, সময় অল্প। সেই সকল কথার মধ্যে তিনটি কথা,

আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। ঐ প্রবন্ধ তিনটি দুইখানি সাময়িক পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্ম বিষয়ক; দ্বিতীয়টি দেবতত্ত্ব বিষয়ক; তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ "নবজীবনে" প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় "প্রচার" নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই।...

আগে অনুশীলন ধর্ম পুনর্মুদ্রিত তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলে ভাল হইত। কেন না "অনুশীলন ধর্মে" যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ। কিন্তু অনুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে।—'কৃষ্ণচরিত্র', ১ম সংস্করণ, ১৮৮৬, "বিজ্ঞাপন"।

ইতিপূর্ব্বে "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে আমি যে কয়টী কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই :—

১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ।—'কৃষ্ণচরিত্র', ২য় সংস্করণ। ১৮৯২, "উপক্রমণিকা"।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে অনেক পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। দুই সংস্করণের পাঠভেদ পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সূচীপত্র

ধর্ম্মতত্ত্ব

প্রথম ভাগ

অনুশীলন

[১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে]

ভূমিকা

গ্রন্থের ভূমিকায় যে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সকলই আমি গ্রন্থের মধ্যে বলিয়াছি। যাঁহারা কেবল ভূমিকা দেখিয়াই পুস্তক পাঠ করা না করা স্থির করেন, তাঁহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করার সম্ভাবনা অল্প। এজন্য ভূমিকায় আমার অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিশেষ, গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়ই একপ্রকার ভূমিকা মাত্র। আমার কথিত অনুশীলনতত্ত্বের প্রধান কথা যাহা, তাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। অন্য ভূমিকায় কোন ফল নাই।

এই দশ অধ্যায় নীরস, এবং মধ্যে মধ্যে দুরূহ, এই দোষ স্বীকার করাই আমার এই ভূমিকার উদ্দেশ্য। সপ্তম অধ্যায় বিশেষতঃ নীরস ও দুরূহ। শ্রেণীবিশেষের পাঠক, সপ্তম অধ্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন।

প্রধানতঃ, শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এজন্য সকল কথা সকল স্থানে বিশদ করিয়া বুঝান যায় নাই। এবং সেই জন্য স্থানে স্থানে ইংরাজি ও সংস্কৃতের অনুবাদ দেওয়া যায় নাই।

এই গ্রন্থের কিয়দংশ নবজীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

অনুশীলন

প্রথম অধ্যায়।—দুঃখ কি?

গুরু। বাচস্পতি মহাশয়ের সম্বাদ কি? তাঁর পীড়া কি সারিয়াছে?

শিষ্য। তিনি ত কাশী গেলেন।

গুরু। কবে আসিবেন?

শিষ্য। আর আসিবেন না। একবারে দেশত্যাগী হইলেন।

গুরু। কেন?

শিষ্য। কি সুখে আর থাকিবেন?

গুরু। দুঃখ কি?

শিষ্য। সবই দুঃখ—দুঃখের বাকি কি? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্ম্মেই সুখ। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অথচ তাঁহার মত দুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত।

গুরু। হয় তাঁর কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্ম্মিক নন।

শিষ্য। তাঁর কোন দুঃখ নাই? সে কি কথা? তিনি চিরদরিদ্র, অন্ন চলে না। তার পর এই কঠিন রোগে ক্লিষ্ট, আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার দুঃখ কাহাকে বলে?

গুরু। তিনি ধার্ম্মিক নহেন।

শিষ্য। সে কি? আপনি কি বলেন যে, এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ এ সকলই অধর্ম্মের ফল?

গুরু। তা বলি।

শিষ্য। পূর্ব্বজন্মের?

গুরু। পূর্ব্বজন্মের কথায় কাজ কি? ইহজন্মের অধর্ম্মের ফল।

শিষ্য। আপনি কি ইহাও মানেন যে, এ জন্মে আমি অধর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া আমার রোগ হয়?

গুরু। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি মান না যে, হিম লাগাইলে সর্দ্দি হয়, কি গুরুভোজন করিলে অজীর্ণ হয়?

শিষ্য। হিম লাগান কি অধর্ম্ম?

গুরু। অন্য ধর্ম্মের মত একটা শারীরিক ধর্ম্ম আছে। হিম লাগান তাহার বিরোধী। এই জন্য হিম লাগান অধর্ম্ম।

শিষ্য। এখানে অধর্ম্ম মানে hygiene?

গুরু। যাহা শারীরিক নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা শারীরিক অধর্ম্ম।

শিষ্য। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তিতা আর নিয়মাতিক্রম?

গুরু। ধর্ম্মাধর্ম্ম অত সহজে বুঝিবার কথা নহে। তাহা হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিকের হাতে রাখিলেই চলিত। তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বলিলেই চলিতে পারে।

শিষ্য। তাই না হয় হইল। বাচস্পতির দারিদ্র্য দুঃখ কোন্ পাপের ফল?

গুরু। দারিদ্র্য দুঃখটা আগে ভাল করিয়া বুঝা যাউক। দুঃখটা কি?

শিষ্য। খাইতে পায় না।

গুরু। বাচস্পতির সে দুঃখ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। কেন না, বাচস্পতি খাইতে না পাইলে এত দিন মরিয়া যাইত।

শিষ্য। মনে করুন, সপরিবারে বুকড়ি চালের ভাত আর কাঁচকলা ভাতে খায়।

গুরু। তাহা যদি শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দুঃখ বটে। কিন্তু যদি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির পক্ষে উহা যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না হইলে দুঃখ বোধ করা, ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ। পেটুক অধার্ম্মিক।

শিষ্য। ছেঁড়া কাপড় পরে।

গুরু। বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হইলেই ধার্ম্মিকের পক্ষে যথেষ্ট। শীতকালে শীত নিবারণও চাই। তাহা মোটা কম্বলেও হয়। তাহা বাচস্পতির জুটে না কি?

শিষ্য। জুটিতে পারে। কিন্তু তাহারা আপনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়।

গুরু। শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম। যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধার্ম্মিক। আমি এমন বলিতেছি না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যে ধনোপার্জ্জনে যত্নবান্,

সে অধার্ম্মিক। বরং যে সমাজে থাকিয়া ধনোপার্জ্জনে যথাবিহিত যত্ন না করে, তাহাকে অধার্ম্মিক বলি। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে দারিদ্র্যপীড়িত মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা এবং কুবাসনা—অর্থাৎ অধর্ম্মে সংস্কার, তাহাদিগের কষ্টের কারণ। অনুচিত ভোগলালসা অনেকের দুঃখের কারণ।

শিষ্য। পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ ?

গুরু। অনেক কোটি কোটি। যাহারা শরীর রক্ষার উপযোগী অন্নবস্ত্র পায় না—আশ্রয় পায় না—তাহারা যথার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ বটে।

শিষ্য। এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের ইহজন্মকৃত অধর্ম্মের ভোগ ?

গুরু। অবশ্য।

শিষ্য। কোন্ অধর্ম্মের ভোগ দারিদ্র্য ?

গুরু। ধনোপার্জ্জনের উপযোগী অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার সংগ্রহের উপযোগী আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। যাহারা তাহার সম্যক্ অনুশীলন করে নাই বা সম্যক্ পরিচালনা করে না, তাহারাই দরিদ্র।

শিষ্য। তবে, বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম্ম, ও তাহার অভাবই অধর্ম্ম।

গুরু। ধর্ম্মতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব, তাহা এত অল্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু মনে কর যদি তাই বলা যায় ?

শিষ্য। এ যে বিলাতী Doctrine of Culture !

গুরু। Culture বিলাতী জিনিষ নহে। ইহা হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ।

শিষ্য। সে কি কথা ? Culture শব্দের একটা প্রতিশব্দও আমাদের দেশীয় কোন ভাষায় নাই।

গুরু। আমরা কথা খুঁজিয়া মরি, আসল জিনিষটা খুঁজি না, তাই আমাদের এমন দশা। দ্বিজবর্ণের চতুরাশ্রম কি মনে কর ?

শিষ্য। System of Culture ?

গুরু। এমন, যে তোমার Matthew Arnold প্রভৃতি বিলাতী অনুশীলনবাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ। সধবার পতিদেবতার উপাসনায়, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে, সমস্ত ব্রতনিয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে, এই অনুশীলনতত্ত্ব অন্তর্নিহিত। যদি

এই তত্ত্ব কখন তোমাকে বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে, শ্রীমদ্ভগবদগীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা এই অনুশীলনতত্ত্বের উপর গঠিত।

শিষ্য। আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট অনুশীলনতত্ত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু আমি যত দূর বুঝি, পাশ্চাত্য অনুশীলনতত্ত্ব ত নাস্তিকের মত। এমন কি, নিরীশ্বর কোমৎ-ধর্ম্ম অনুশীলনের অনুষ্ঠান পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়।

গুরু। এ কথা অতি যথার্থ। বিলাতী অনুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর, এই জন্য উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত অথবা উহা অসম্পূর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর,—ঠিক সেটা বুঝি না। কিন্তু হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাহাদিগের অনুশীলনতত্ত্ব জগদীশ্বর-পাদপদ্মেই সমর্পিত।

শিষ্য। কেন না, উদ্দেশ্য মুক্তি। বিলাতী অনুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য সুখ। এই কথা কি ঠিক?

গুরু। সুখ ও মুক্তি, পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত কি না? মুক্তি কি সুখ নয়?

শিষ্য। প্রথমতঃ, মুক্তি সুখ নয়—সুখদুঃখ মাত্রেরই অভাব। দ্বিতীয়তঃ, মুক্তি যদিও সুখবিশেষ বলেন, তথাপি সুখমাত্র মুক্তি নয়। আমি দুইটা মিঠাই খাইলে সুখী হই, আমার কি তাহাতে মুক্তি লাভ হয়?

গুরু। তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফেলিলে। সুখ এবং মুক্তি, এই দুইটা কথা আগে বুঝিতে হইবে, নহিলে অনুশীলনতত্ত্ব বুঝা যাইবে না। আজ আর সময় নাই—আইস, একটু ফুলগাছে জল দিই, সন্ধ্যা হইল। কাল সে প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—সুখ কি?

শিষ্য। কাল আপনার কথায় এই পাইলাম যে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলনের অভাবই আমাদের দুঃখের কারণ। বটে?

গুরু। তার পর?

শিষ্য। বলিয়াছি যে, বাচস্পতির নির্ব্বাসনের একটি কারণ এই যে, তাঁহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। আগুন কাহার দোষে কি প্রকারে লাগিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না—কিন্তু বাচস্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। তাঁহার কোন্ অনুশীলনের অভাবে গৃহ দগ্ধ হইল?

গুরু। অনুশীলনতত্ত্বটা না বুঝিয়াই আগে হইতে কি প্রকারে সে কথা বুঝিবে? সুখদুঃখ মানসিক অবস্থা মাত্র—সুখদুঃখের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই। মানসিক অবস্থা মাত্রেই যে সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনের অধীন, তাহা তুমি স্বীকার করিবে। এবং ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, মানসিক শক্তি সকলের যথাবিহিত অনুশীলন হইলে গৃহদাহ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে না।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে হইবে না। কি ভয়ানক!

গুরু। সচরাচর যাহাকে বৈরাগ্য বলে, তাহা ভয়ানক ব্যাপার হইলে হইতে পারে। কিন্তু তাহার কথা হইতেছে কি?

শিষ্য। হইতেছে বৈ কি? হিন্দুধর্ম্মের টান সেই দিকে। সাংখ্যকার বলেন, তিন প্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি পরমপুরুষার্থ। তার পর আর এক স্থানে বলেন যে, সুখ এত অল্প যে, তাহাও দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করিবে। অর্থাৎ সুখ দুঃখ সব ত্যাগ করিয়া, জড়পিণ্ডে পরিণত হও। আপনার গীতোক্ত ধর্ম্মও তাই বলেন। শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব সকল তুল্য জ্ঞান করিবে। যদি সুখে সুখী না হইবে—তবে জীবনে কাজ কি? যদি ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সুখ পরিত্যাগ, তবে আমি সে ধর্ম্ম চাই না। এবং অনুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য যদি ঈদৃশ ধর্ম্মই হয়, তবে আমি অনুশীলনতত্ত্ব শুনিতে চাই না।

গুরু। অত রাগের কথা কিছু নাই—আমার এই অনুশীলনতত্ত্বে তোমার দুইটা মিঠাই খাওয়ার পক্ষে কোন আপত্তি হইবে না—বরং বিধিই থাকিবে। সাংখ্যদর্শনকে তোমাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বসম্বন্ধীয় যে উপদেশ, তাহারও এমন অর্থ নহে যে, মনুষ্যের সুখভোগ করা কর্ত্তব্য নহে। উহার অর্থ কি, তাহার কথায় এখন কাজ নাই। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, বিলাতী অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ, ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য মুক্তি। আমি তদুত্তরে বলি, মুক্তি সুখের অবস্থাবিশেষ। সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোৎকর্ষ। যদি এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্যও সুখ।

শিষ্য। অর্থাৎ ইহকালে দুঃখ ও পরকালে সুখ।

গুরু। না, ইহকালে সুখ ও পরকালে সুখ।

শিষ্য। কিন্তু আমার আপত্তির উত্তর হয় নাই—আমি ত বলিয়াছিলাম যে, জীব মুক্ত হইলে সে সুখদুঃখের অতীত হয়। সুখশূন্য যে অবস্থা, তাহাকে সুখ বলিব কেন?

গুরু। এই আপত্তি খণ্ডন জন্য, সুখ কি ও মুক্তি কি, তাহা বুঝা প্রয়োজন। এখন, মুক্তির কথা থাক। আগে সুখ কি, তাহা বুঝিয়া দেখা যাক।

শিষ্য। বলুন।

গুরু। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, দুইটা মিঠাই খাইতে পাইলে তুমি সুখী হও। কেন সুখী হও, তাহা বুঝিতে পার?

শিষ্য। আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়।

গুরু। এক মুঠা শুকনা চাউল খাইলেও তাহা হয়—মিঠাই খাইলে ও শুকনা চাল খাইলে কি তুমি তুল্য সুখী হও?

শিষ্য। না। মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই।

গুরু। তাহার কারণ কি?

শিষ্য। মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মনুষ্য-রসনার এরূপ কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, সেই সম্বন্ধ জন্যই মিষ্ট লাগে।

গুরু। মিষ্ট লাগে সে জন্য বটে, কিন্তু তাহা ত জিজ্ঞাসা করি নাই। মিঠাই খাওয়ায় তোমার সুখ কি জন্য? মিষ্টতায় সকলের সুখ নাই। তুমি এক জন আসল বিলাতী সাহেবকে একটা বড়বাজারের সন্দেশ কি মিহিদানা সহজে খাওয়াইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে তুমি এক টুকরা রোষ্ট বীফ খাইয়া সুখী হইবে না। 'রবিন্সন্ ক্রুশো' গ্রন্থের ফ্রাইডে নামক বর্ব্বরকে মনে পড়ে? সেই আমমাংসভোজী বর্ব্বরের মুখে সলবণ সুসিদ্ধ মাংস ভাল লাগিত না। এই সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহা রসনার সঙ্গে ঘৃতশর্করাদির নিত্য সম্বন্ধ বশতঃ নহে। তবে কি?

শিষ্য। অভ্যাস।

গুরু। তাহা না বলিয়া অনুশীলন বল।

শিষ্য। অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক?

গুরু। এক নহে বলিয়াই বলিতেছি যে, অভ্যাস না বলিয়া অনুশীলনই বল।

শিষ্য। উভয়ে প্রভেদ কি?

গুরু। এখন তাহা বুঝাইবার সময় নহে। অনুশীলনতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাহা বুঝিতে পারিবে না। তবে কিছু শুনিয়া রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার কুইনাইনের স্বাদ কেমন লাগে? কখন সুখদ হয় কি?

শিষ্য। বোধ করি কখন সুখদ হয় না, কিন্তু ক্রমে তিক্ত সহ্য হইয়া যায়।

গুরু। সেইটুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শক্তির অনুকূল; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা। এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। এখানে তোমার চেষ্টা স্বাভাবিকী রসাস্বাদিনী শক্তির অনুকূল, এজন্য তোমার সে শক্তি অনুশীলিত হইয়াছে—মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও। ঐরূপ অনুশীলনবলে তুমি রোষ্ট বীফ খাইয়াও সুখী হইতে পার। অন্যান্য ভক্ষ্য পেয় সম্বন্ধেও সেইরূপ।

এ গেল একটা ইন্দ্রিয়ের সুখের কথা। আমাদের আর আর ইন্দ্রিয় আছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনেও ঐরূপ সুখোৎপত্তি।

কতকগুলি শারীরিক শক্তি বিশেষের নাম দেওয়া গিয়াছে ইন্দ্রিয়। আরও অনেকগুলি শারীরিক শক্তি আছে। যথা, গীতবাদ্যের তাল বোধ হয় যে শক্তির অনুশীলনে, তাহাও শারীরিক শক্তি। সাহেবেরা তাহার নাম দিয়াছেন muscular sense। এইরূপ আর আর শারীরিক শক্তি আছে। এ সকলের অনুশীলনেও ঐরূপ সুখ।

তা ছাড়া, আমাদের কতকগুলি মানসিক শক্তি আছে। সেগুলির অনুশীলনের যে ফল, তাহাও সুখ। ইহাই সুখ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সুখ নাই। ইহার অভাব দুঃখ। বুঝিলে?

শিষ্য। না। প্রথমতঃ শক্তি কথাটাতেই গোল পড়িতেছে। মনে করুন, দয়া আমাদিগের মনের একটি অবস্থা। তাহার অনুশীলনে সুখ আছে। কিন্তু আমি কি বলিব যে, দয়া শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে?

গুরু। শক্তি কথাটা গোলের বটে। তৎপরিবর্তে অন্য শব্দের আদেশ করার প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই। আগে জিনিসটা বুঝ, তার পর যাহা বলিবে, তাহাতেই বুঝা যাইবে। শরীর এক ও মন এক বটে, তথাপি ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে; এবং কাজেই সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সম্পাদনকারিণী বিশেষ বিশেষ শক্তি কল্পনা করা অবৈজ্ঞানিক হয় না। কেন না, আদৌ এই সকল শক্তির মূল এক হইলেও, কার্য্যতঃ ইহাদিগের পার্থক্য দেখিতে পাই। যে অন্ধ, সে দেখিতে পায় না, কিন্তু শব্দ শুনিতে পায়; যে বধির, সে শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু চক্ষে দেখিতে পায়। কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না, কিন্তু সে হয়ত সুকল্পনাবিশিষ্ট কবি; আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্তু বড় মেধাবী। কেহ ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য, কিন্তু লোককে দয়া করে; আবার নির্দ্দয় লোককেও

ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে।* সুতরাং দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে কতকগুলি শক্তি—যথা স্নেহ, দয়া ইত্যাদিকে শক্তি বলা ভাল শুনায় না। কিন্তু অন্য ব্যবহার্য্য শব্দ কি আছে?

শিষ্য। ইংরাজি শব্দটা faculty, অনেক বাঙ্গালি লেখক বৃত্তি শব্দের দ্বারা তাহার অনুবাদ করিয়াছেন।

গুরু। পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে বৃত্তি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত। বৃত্তি শব্দ চলিয়াছে।

গুরু। তবে বৃত্তিই চালাও। বুঝিলেই হইল। যখন তোমরা morals অর্থে "নীতি" শব্দ চালাইয়াছ, Science অর্থে "বিজ্ঞান" চালাইয়াছ, তখন faculty অর্থে বৃত্তি শব্দ চালাইলে দোষ ধরিব না।

শিষ্য। তার পর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আপনি বলিলেন, বৃত্তির অনুশীলন সুখ—কিন্তু জল বিনা তৃষ্ণার অনুশীলনে দুঃখ।

গুরু। রও। বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি, চরমে পরিণতাবস্থা, তার পর উদ্দিষ্ট বস্তুর সম্মিলনে পরিতৃপ্তি। এই স্ফূর্ত্তি এবং পরিতৃপ্তি উভয়ই সুখের পক্ষে আবশ্যক।

শিষ্য। ইহা যদি সুখ হয়, তবে বোধ হয়, এরূপ সুখ মনুষ্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে।

গুরু। কেন?

শিষ্য। ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনুশীলনে ও পরিতৃপ্তিতে সুখ। তাই কি তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত?

গুরু। না। তাহা নহে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়প্রবলতাহেতু মানসিক বৃত্তি সকলের অস্ফূর্ত্তি এবং ক্রমশঃ বিলোপ হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে স্থূল নিয়ম হইতেছে সামঞ্জস্য। ইন্দ্রিয় সকলেরও এককালীন বিলোপ ধর্ম্মানুমত নহে। তাহাদের সামঞ্জস্যই ধর্ম্মানুমত। বিলোপে ও সংযমে অনেক প্রভেদ। সে কথা পশ্চাৎ বুঝাইব। এখন স্থূল কথাটা বুঝিয়া রাখ যে, বৃত্তি সকলের অনুশীলনের স্থূল নিয়ম পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্য কি, তাহা সবিস্তারে একদিন বুঝাইব। এখন কথাটা এই বুঝাইতেছি যে, সুখের উপাদান কি?

* উদাহরণ—বিলাতের সপ্তদশ শতাব্দীর Puritan সম্প্রদায়। অপিচ, Inquisition অধ্যক্ষেরা।

প্রথম। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের অনুশীলন। তজ্জনিত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি।

দ্বিতীয়। সেই সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য।

তৃতীয়। তাদৃশ অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃপ্তি।

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই। আমি সময়ান্তরে তোমাকে বুঝাইতে পারি, যোগীর যোগজনিত যে সুখ, তাহাও ইহার অন্তর্গত। ইহার অভাবই দুঃখ। সময়ান্তরে আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি যে, বাচস্পতির গৃহদাহজনিত যে দুঃখ, অথবা তদপেক্ষাও হতভাগ্য ব্যক্তির পুত্রশোকজনিত যে দুঃখ, তাহাও এই দুঃখ। আমার অবশিষ্ট কথাগুলি শুনিলে তুমি আপনি তাহা বুঝিতে পারিবে, আমাকে বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। মনে করুন, তাহা যেন বুঝিলাম, তথাপি প্রধান কথাটা এখনও বুঝিলাম না। কথাটা এই হইতেছিল যে, আমি বলিয়াছিলাম যে, বাচস্পতি ধার্ম্মিক ব্যক্তি, তথাপি দুঃখী। আপনি বলিলেন যে, যখন সে দুঃখী, তখন সে কখনও ধার্ম্মিক নহে। আপনার কথা প্রমাণ করিবার জন্য, আপনি সুখ কি, তাহা বুঝাইলেন; এবং সুখ বুঝাতে বুঝিলাম যে, দুঃখ কি। ভাল, তাহাতে যেন বুঝিলাম যে, বাচস্পতি যথার্থ দুঃখী নহেন, অথবা তাঁহাকে যদি দুঃখী বলা যায়, তবে তিনি নিজের দোষে, অর্থাৎ নিজ শারীরিক বা মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ত্রুটি করাতে এই দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে এমন কিছুই বুঝা গেল না যে, তিনি অধার্ম্মিক। এ অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, তাহা ত কিছুই বুঝা গেল না। যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে সে এই যে, অনুশীলনই ধর্ম্ম।

গুরু। এক্ষণে তাই মনে করিতে পার। তাহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর কথা আছে, তাহা না বুঝাইলে অনুশীলনের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু সেটা আমাকে সর্ব্বশেষে বলিতে হইবে, কেন না, অনুশীলন কি, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে সে তত্ত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

শিষ্য। অনুশীলন আবার ধর্ম্ম! এ সকল নূতন কথা।

গুরু। নূতন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।—ধর্ম্ম কি?

শিষ্য। অনুশীলনকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। অনুশীলনের ফল সুখ, ধর্ম্মের ফলও কি সুখ?

গুরু। না ত কি ধর্ম্মের ফল দুঃখ? যদি তা হইত, তাহা হইলে আমি জগতের সমস্ত লোককে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম।

শিষ্য। ধর্ম্মের ফল পরকালে সুখ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও কি তাই?

গুরু। তবে বুঝাইলাম কি! ধর্ম্মের ফল ইহকালে সুখ, ও যদি পরকাল থাকে, তবে পরকালেও সুখ। ধর্ম্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অন্য উপায় নাই।

শিষ্য। তথাপি গোল মিটিতেছে না। আমরা বলি খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—তৎপরিবর্ত্তে কি খৃষ্ট অনুশীলন, বৌদ্ধ অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বলিতে পারি?

গুরু। ধর্ম্ম কথাটার অর্থটা উল্‌টাইয়া দিয়া তুমি গোলযোগ উপস্থিত করিলে। *ধর্ম্ম শব্দটা নানা প্রকার অর্থে* ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই;* তুমি যে অর্থে এখন ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিলে, উহা ইংরেজি Religion শব্দের আধুনিক তর্জমা মাত্র। দেশী জিনিস নহে।

শিষ্য। ভাল, religion কি তাহাই না হয় বুঝান।

গুরু। কি জন্য? Religion পাশ্চাত্য শব্দ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহা নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন; কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলে না।†

শিষ্য। কিন্তু রিলিজনের ভিতর এমন কি নিত্য বস্তু কিছুই নাই, যাহা সকল রিলিজনে পাওয়া যায়?

গুরু। আছে। কিন্তু সেই নিত্য পদার্থকে রিলিজন বলিবার প্রয়োজন নাই; তাহাকে ধর্ম্ম বলিলে আর কোন গোলযোগ হইবে না।

শিষ্য। তাহা কি?

গুরু। সমস্ত মনুষ্য জাতি—কি খৃষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই পক্ষে যাহা ধর্ম্ম।

---

* ক চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ।

† খ চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ।

শিষ্য। কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়?

গুরু। মনুষ্যের ধর্ম্ম কি, তাহার সন্ধান করিলেই পাওয়া যায়।

শিষ্য। তাই ত জিজ্ঞাস্য।

গুরু। উত্তরও সহজ। চৌম্বকের ধর্ম্ম কি?

শিষ্য। লৌহাকর্ষণ।

গুরু। অগ্নির ধর্ম্ম কি?

শিষ্য। দাহকতা।

গুরু। জলের ধর্ম্ম কি?

শিষ্য। দ্রাবকতা।

গুরু। বৃক্ষের ধর্ম্ম কি?

শিষ্য। ফল পুষ্পের উৎপাদকতা।

গুরু। মানুষের ধর্ম্ম কি?

শিষ্য। এক কথায় কি বলিব?

গুরু। মনুষ্যত্ব বল না কেন?

শিষ্য। তাহা হইলে মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে হইবে।

গুরু। কাল তাহা বুঝাইব।

চতুর্থ অধ্যায়।—মনুষ্যত্ব কি?

গুরু। মনুষ্যত্ব বুঝিলে ধর্ম্ম সহজে বুঝিতে পারিবে। তাই আগে মনুষ্যত্ব বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ। এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বটগাছ দেখিতেছ—দুইটিই কি এক জাতীয়?

শিষ্য। হাঁ, এক হিসাবে এক জাতীয়। উভয়েই উদ্ভিদ্।

গুরু। দুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে?

শিষ্য। না, বটকেই বৃক্ষ বলিব—ওটি তৃণ মাত্র।

গুরু। এ প্রভেদ কেন?

শিষ্য। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল এই লইয়া বৃক্ষ। বটের এ সব আছে, ঘাসের এ সব নাই।

গুরু। ঘাসেরও সব আছে—তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত। ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না?

শিষ্য। ঘাস আবার বৃক্ষ?

গুরু। যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি পরিণত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ভিত্ত্ব আছে, একজন হটেণ্টট্ বা চিপেবারও সেরূপ মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যে উদ্ভিত্ত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের নাই, তেমনি যে মনুষ্যত্ব মনুষ্যধর্ম্ম, হটেণ্টট্ বা চিপেবার সে মনুষ্যত্ব নাই। বৃক্ষত্বের উদাহরণ ছাড়িও না, তাহা হইলেই বুঝিবে। ঐ বাঁশঝাড় দেখিতেছ—উহাকে বৃক্ষ বলিবে?

শিষ্য। বোধ হয় বলিব না। উহার কাণ্ড, শাখা ও পল্লব আছে; কিন্তু কৈ? উহার ফুল ফল হয় না; উহার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি নাই; উহাকে বৃক্ষ বলিব না।

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে এক একবার উহার ফুল হয়। ফুল হইয়া ফল হয়, তাহা চালের মত। চালের মত তাহাতে ভাতও হয়।

শিষ্য। তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব।

গুরু। অথচ বাঁশ তৃণ মাত্র। একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাঁশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ—মিলিবে। উদ্ভিত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বাঁশকে তৃণশ্রেণী মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখ, স্ফূর্ত্তিগুণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ। অথচ বাঁশের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি নাই। যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি সম্পুর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।

শিষ্য। এরূপ পরিণতি কি ধর্ম্মের আয়ত্ত?

গুরু। উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল; লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্ত্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদাহরণে বুঝাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া বলেন যে, বৃক্ষ আর ঘাস, এই দুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না। হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহা হইলে তুমি কি চাহিবে? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস রাখিতে চাহিবে?

শিষ্য। বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঁটাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব।

গুরু। মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলে অন্নাভাবে মারা যাইবে যে? জান না যে, ধানও তৃণজাতীয়? যে ভাঁটুই দেখিতেছ, উহা ভাল করিয়া দেখিয়া

আইল। ধানের পাট হইবার পূর্ব্বে ধানও ঐরূপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্য জীবনদায়িনী লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে। গমও ঐরূপ। যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম অবস্থায় সমুদ্রতীরবাসী তিক্তস্বাদ কদর্য্য উদ্ভিদ্ ছিল—কর্ষণে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই ; এজন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাম, CULTURE। এই জন্য কথিত হইয়াছে যে, "The Substance of Religion is Culture." "মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম।"

শিষ্য। তাহা হউক। স্থূল কথাও কিছুই বুঝিতে পারি নাই—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে ?

গুরু। অঙ্কুরের পরিণাম, মহামহীরুহ। মাটি খোঁজ, হয়ত একটি অতি ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য, অঙ্কুর দেখিতে পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্কুর এই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ—কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাটি চাই—জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের পোষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই—বৃক্ষের জাতিবিশেষে মাটিতে সার দেওয়া চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অঙ্কুর সুবৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যেরও এইরূপ। যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্ব্বগুণযুক্ত, সর্ব্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সর্ব্বসুখী সর্ব্বগুণযুক্ত কি সকল মনুষ্য হইতে পারে ?

গুরু। কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক বিচার। তবে ইহা স্বীকার করিব যে, এ পর্য্যন্ত কেহ কখন হয় নাই। আর সহসা কেহ হইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে আমি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই হইবে যে, লোকে সর্ব্বগুণ অর্জ্জনের জন্য যত্নে বহুগুণসম্পন্ন হইতে পারিবে ; সর্ব্বসুখ লাভের চেষ্টায় বহু সুখলাভ করিতে পারিবে।

শিষ্য। আমাকে ক্ষমা করুন—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে, তাহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। চেষ্টা কর। মনুষ্যের দুইটি অঙ্গ, এক শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে ; যথা,—হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ;

মস্তিষ্ক, হৃৎ, বায়ুকোষ, অন্ত্র প্রভৃতি জীবনসঞ্চালক প্রত্যঙ্গ; অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, শোণিত প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। এ সকলের বিহিত পরিণতি চাই। আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ—

শিষ্য। মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক পরিণতি ভাল করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বাহু বয়োগুণে আপনিই বর্দ্ধিত ও বলশালী হইবে। তাহা ছাড়া আবার কি চাই?

গুরু। তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, তাহার দুইটি কারণ। আমিও সেই দুইটির উপর নির্ভর করিতেছি। সেই দুইটি কারণ পোষণ ও পরিচালনা। তুমি কোন শিশুর একটি বাহু, কাঁধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না যাইতে পারে। তাহা হইলে, ঐ বাহু আর বাড়িবে না, হয়ত অবশ, নয় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না। আবার, বাঁধিয়া কাজ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে না পারে। তাহা হইলে ঐ হাত অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্ত সঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিতা জৈবকার্য্যে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না। ঊর্দ্ধবাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত?

শিষ্য। বুঝিলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বাহু পরিণতবয়স্ক মানুষের বাহুর বিস্তার, বল ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ ত সকলেরই সহজেই হয়। আর কি চাই?

গুরু। তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি তোমার বাহুস্থিত অঙ্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয়াছ যে, এখনই পাঁচ মিনিটে তুমি দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু ঐ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মত একটি "ক" লিখিতে পারিবে না। তুমি যে না ভাবিয়া, না যত্ন করিয়া অবহেলায় যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা উহার পক্ষে অতিশয় বিস্ময়কর, ভাবিয়া সে কিছু বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই জন্য সভ্য সমাজে লিপিবিদ্যা বিস্ময়কর অনুশীলন বলিয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই লিপিবিদ্যা ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য্য অনুশীলনফল। দেখ, একটি শব্দ লিখিতে গেলে, মনে কর এই অনুশীলন শব্দ লিখিতে গেলে,—প্রথমে এই শব্দটির বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে—বিশ্লেষণে পাইতে

হইবে, অ, ন, উ, শ, ঈ, ল, ন। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে। এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক একটি কাগজে আঁকিতে হইবে। অথচ তুমি এত শীঘ্র লিখিবে যে, তাহাতে বুঝাইবে যে, তুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছ না। অনুশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী। অনুশীলনজনিত আরও প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। তুমি যেমন পাঁচ মিনিটে দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালী তেমনি পাঁচ মিনিটে এক কাঠা জমিতে কোদালি দিবে। তুমি দুই ঘণ্টায় হয়ত দুই প্রহরেও তাহা পারিয়া উঠিবে না। এ বিষয়ে তোমার বাহু উপযুক্তরূপে চালিত অর্থাৎ অনুশীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত; সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিল না; অনেক গায়ক সচরাচর স্বভাবতঃ সুকণ্ঠ নহে। কিন্তু অনুশীলন গুণে গায়ক সুকণ্ঠ হইয়াছে, তাহার কণ্ঠের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে। আবার দেখ,—বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ হাঁটিতে পার?

শিষ্য। আমি বড় হাঁটিতে পারি না; বড় জোর এক ক্রোশ।

গুরু। তোমার পদদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় নাই। দেখ তোমার হাত, পা, গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে—কিন্তু একেরও সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি না হইলে শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না; কেন না, ভগ্নাংশগুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পুরা টাকাতেই কম্‌তি হয়। যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, সেগুলিকে বৃত্তি বলা গিয়াছে। কতকগুলির কাজ জ্ঞানার্জ্জন ও বিচার। কতকগুলির কাজ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়া—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদন। এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি।

শিষ্য। অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ব্ববিধ

শারীরিক ক্রিয়ার সুদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণার্জ্জুন আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখন এরূপ হইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই।

গুরু। যাহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্যজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগুণবর্ণনা যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অনুমেয় যে, এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে। ষোল আনা কি, তাহা না জানিলে আট আনা পাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় ষোল আনা ইহা বুঝে না, সে টাকার মূল্য স্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে।

শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মানুষ ত দেখি না।

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্ব্বগুণের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এই জন্য বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে, ধর্ম্ম সম্যক্ ধর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, কেন না যিনি নির্গুণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" চৈতন্য অথবা যাহাকে হর্বর্ট স্পেন্সর "Inscrutable Power in Nature" বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম্মপুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্ম্মের মূল, কেন না তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাঁহাকে "Impersonal God" বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল; যাঁহাকে "Personal God" বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।

শিষ্য। মানিলাম সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে। কিন্তু উপাসনার প্রয়োজন কি?

গুরু। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা। তবে

বেগার টালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে;—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার নির্ম্মলতার মত নির্ম্মলতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্ব্বত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য্য ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব,—ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

শিষ্য। আমি এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোঁটা জল, তাহাতে গিয়া মিশিব।

গুরু। উপাসনা-তত্ত্বের সার মর্ম্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও সুসার উপাসনাপদ্ধতি এক দিকে আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে।

শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। মনুষ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের, অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়?

গুরু। এই জন্য ধর্ম্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্ম্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউ টেষ্টেমেণ্টের, এবং আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ। ধর্ম্মেতিহাসে (Religious History) প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়,

অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখৃষ্ট খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্ম্মম ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্ম্মুকহস্তেও ধর্ম্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।

শিষ্য। সে কি? কৃষ্ণ!

গুরু। তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন—তাই শিহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পশ্চাতে, ঈশ্বরের সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র কীর্ত্তিত আছে তাহার কিছুই জান না। তাঁহার শারীরিক বৃত্তি সকল সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তি সকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্ব্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্ত্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল

সময়ে, বলিয়াছিলেন, "বেদে ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে"—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্বত্রপ্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ।
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে॥

পঞ্চম অধ্যায়।—অনুশীলন।

শিষ্য। অদ্য অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসনা করি।

গুরু। সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমরা পাইয়াছি কেবল দুইটা কথা। (১) মানুষের সুখ, মনুষ্যত্বে; (২) এই মনুষ্যত্ব, সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ। এক্ষণে, এই বৃত্তিগুলি কি প্রকার, তাহার কিছু পর্য্যালোচনার প্রয়োজন।

বৃত্তিগুলিকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) শারীরিক ও (২) মানসিক। মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জ্জন করে, কতকগুলি কাজ করে, বা কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়, আর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জ্জন করে না, কোন বিশেষ কার্য্যের প্রবর্ত্তকও নয়, কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যেগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞান, সেগুলিকে জ্ঞানার্জ্জনী বলিব। যেগুলির প্রবর্ত্তনায় আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, বা হইতে পারি, সেগুলিকে কার্য্যকারিণী বৃত্তি বলিব। আর যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায়, সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম্ম, আনন্দ, এ ত্রিবিধ বৃত্তির ত্রিবিধ ফল। সচ্চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপ্য।

শিষ্য। এই বিভাগ কি বিশুদ্ধ? সকল বৃত্তির পরিতৃপ্তিতেই ত আনন্দ?

গুরু। তা বটে। কিন্তু এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে যাহাদিগের পরিতৃপ্তির ফল কেবল আনন্দ—আনন্দ ভিন্ন অন্য ফল নাই। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞানলাভ, গৌণ ফল আনন্দ। কার্য্যকারিণী বৃত্তির মুখ্য ফল কার্য্যে প্রবৃত্তি, গৌণ ফল আনন্দ। কিন্তু এগুলির মুখ্য ফলই আনন্দ—অন্য ফল নাই। পাশ্চাত্ত্যেরা ইহাকে Æsthetic Faculties বলেন।

শিষ্য। পাশ্চাত্যেরা Æsthetic ও Intellectual বা Emotinal মধ্যে ধরেন, কিন্তু আপনি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি পৃথক্ করিলেন।

গুরু। আমি ঠিক পাশ্চাত্যদিগের অনুসরণ করিতেছি না। ভরসা করি অনুসরণ করিতে বাধ্য নহি। সত্যের অনুসরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখন মানুষের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জ্জনী (৩) কার্য্যকারিণী (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।

শিষ্য। ক্রোধাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীরিক বৃত্তি। এগুলিরও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি কি মনুষ্যত্বের উপাদান?

গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া সে আপত্তির মীমাংসা করিতেছি।

শিষ্য। কিন্তু অন্য প্রকার আপত্তিও আছে। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে ত নূতন কিছু পাইলাম না। সকলেই বলে ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি হয়। অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সক্ষম, তাহারা পোষ্যগণকে সুশিক্ষা দিয়া জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়া থাকে—তাই সভ্য জগতে এত বিদ্যালয়। তৃতীয়তঃ—কার্য্যকারিণী বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাদৃশ ঘটিয়া উঠে না বটে, তবু তাহার ঔচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফুরণও কতক বাঞ্ছনীয় বলিয়া যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সুক্ষ্ম শিল্পের অনুশীলন। নূতন আমাকে কি শিখাইলেন?

গুরু। এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ আমি যে কোন নূতন সম্বাদ লইয়া স্বর্গ হইতে সদ্য নামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে স্থির করিয়া রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন। নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ, আমি ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। ধর্ম্ম পুরাতন, নূতন নহে। আমি নূতন ধর্ম্ম কোথায় পাইব?

শিষ্য। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্ম্মের অংশ বলিয়া খাড়া করিতেছেন, ইহাই দেখিতেছি নূতন।

গুরু। তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দুধর্ম্মে আছে। এই জন্য সকল হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রেই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে। হিন্দুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন

করিতে হইবে, কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্যাশ্রমও শিক্ষানবিশী মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন; গার্হস্থ্যে কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন। এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি সংস্থাপনের জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ব্যস্ত। আমিও সেই আর্য্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্ব্বক, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন, "না, তাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্ম্মের মর্ম্মের বিপরীতাচরণ হইবে।" হিন্দুধর্ম্মের সেই মর্ম্মভাগ, অমর; চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিত সাধন করিবে, কেন না মানব প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষবিধি সকল, সকল ধর্ম্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য্য বা পরিবর্ত্তনীয়। হিন্দুধর্ম্মের নব সংস্কারের এই স্থূল কথা।

শিষ্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতী কথা আনিয়া ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ ইহা কোম্‌তের মত।

গুরু। হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্‌ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খৃষ্ট ধর্ম্মে ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইণ্টীন্থ সেঞ্চুরিতে হর্বর্ট স্পেন্সর কোম্‌ত মত প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্ম্মতঃ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ। স্পিনোজার মতের সঙ্গেও বেদান্ত মতের সাদৃশ্য আছে। বেদান্তের সঙ্গে হর্বর্ট স্পেন্সরের বা স্পিনোজার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া বেদান্তটা হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি বা স্পিনোজীয় বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিব না—বরং স্পিনোজা বা স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়া হিন্দু মধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধর্ম্মের যাহা স্থূল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার একটু আধটু ছুঁইতে পারিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার ইহা সামান্য প্রমাণ নহে।

* শিষ্য। যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি ধর্ম্মের শাসনাধীন হইল, তবে ধর্ম্ম ছাড়া কি?

গুরু। কিছুই ধর্ম্ম ছাড়া নহে। ধর্ম্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বাংশই ধর্ম্ম কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে ?

ষষ্ঠ অধ্যায়।—সামঞ্জস্য।

শিষ্য। বৃত্তির অনুশীলন কি তাহা বুঝিলাম। এখন সে সকলের সামঞ্জস্য কি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। শারীরিক প্রভৃতি বৃত্তিগুলি কি সকলই তুল্যরূপে অনুশীলিত করিতে হইবে ? কাম, ক্রোধ, বা লোভের যেরূপ অনুশীলন ভক্তি, প্রীতি, দয়ারও কি সেইরূপ অনুশীলন করিব ? পূর্ব্বগামী ধর্ম্মবেত্তৃগণ বলিয়া থাকেন যে, কাম ক্রোধাদির দমন করিবে, এবং ভক্তিপ্রীতিদয়াদির অপরিমিত অনুশীলন করিবে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে সামঞ্জস্য কোথায় রহিল ?

গুরু। ধর্ম্মবেত্তৃগণ যাহা বলিয়া আসিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ কারণ আছে। ভক্তিপ্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্য বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে। সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য যাহাকে বলিয়াছি তাহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে স্ফুরিত ও বর্দ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে সুরম্য উদ্যান হয়। কিন্তু এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণ-শক্তি সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামঞ্জস্যের হানি হইল। মনুষ্যচরিত্রেও সেইরূপ। কতকগুলি বৃত্তি—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া,—ইহাদিগের সম্প্রসারণশক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক; এবং এইগুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত স্ফূর্ত্তি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল। পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি,—সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণশক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলির

অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন হয়। সুতরাং সেগুলি যত দূর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, তত দূর স্ফূর্ত্তি পাইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। সেগুলি তেঁতুল গাছ, তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে। আমি এমন বলিতেছি না যে, সেগুলি বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহা অকর্ত্তব্য, কেন না অন্যে প্রয়োজন আছে—নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে সকল কথা সবিস্তারে পরে বলিতেছি। তেঁতুল গাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার স্থান এক কোণে। বড় বাড়িতে না পায়—বাড়িলেই ছাঁটিয়া দিবে। দুই একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল—তার বেশী আর না বাড়িতে পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী স্ফূর্ত্তি হইলেই হইল—তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য বলিয়াছি।

শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে—যথা কামাদি, যাহার দমনই সমুচিত স্ফূর্ত্তি।

গুরু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের ধ্বংসে মনুষ্য জাতির ধ্বংস ঘটিবে। সুতরাং এই অতি কদর্য্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম। আমাদের পরম রমণীয় হিন্দুধর্ম্মেরও এই বিধি। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ইহার ধ্বংস বিহিত করেন নাই, বরং ধর্ম্মার্থ তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্ম্মের অংশ। তবে ধর্ম্মের প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে স্ফূর্ত্তি, তাহা হিন্দুশাস্ত্রানুসারেও নিষিদ্ধ—এবং তদনুগামী এই ধর্ম্মব্যাখ্যা যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ হইতেছে। কেন না, বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয় তাহার অতিরিক্ত যে স্ফূর্ত্তি তাহা সামঞ্জস্যের বিঘ্নকর, এবং উচ্চতর বৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিরোধক। যদি অনুচিত স্ফূর্ত্তিরোধকে দমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির দমনই সমুচিত অনুশীলন। এই অর্থে ইন্দ্রিয়দমনই পরম ধর্ম্ম।

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোক রক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য আপনি এ সকল কথা বলিতে পারিলেন, কিন্তু অপরাপর অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে না।

গুরু। সকল অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে। কোন্‌টির সম্বন্ধে খাটে না?

শিষ্য। মনে করুন ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে আমি ত কোন অনিষ্ট দেখি না।

গুরু। ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। দণ্ডনীতি—বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দণ্ডনীতির উচ্ছেদে সমাজের উচ্ছেদ।

শিষ্য। দণ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না, বরং দয়ামূলক বলা ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না, সর্ব্বলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই, দণ্ডশাস্ত্রপ্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভূত করিয়াছেন। এবং সর্ব্বলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই রাজা দণ্ড প্রণয়ন করিয়া থাকেন।

গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিয়া দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্টকারীর বিরোধী হই। এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে যে, আমরা কেবল বুদ্ধিবলেই স্থির করিতে পারি যে, অনিষ্টকারীর নিবারণ করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যে প্রেরিত হইলে, ক্রুদ্ধের যে ক্ষিপ্রকারিতা এবং আগ্রহ তাহা আমরা কদাচ পাইব না। তার পর যখন মনুষ্য পরকে আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল হইয়া দাঁড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহা বিধিবদ্ধ হইলে দণ্ডনীতি হইল।

শিষ্য। লোভে ত আমি কিছু ধর্ম্ম দেখি না।

গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত স্ফূর্ত্তিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত এবং সমঞ্জসীভূত স্ফূর্ত্তি—ধর্ম্মসঙ্গত অর্জ্জনস্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ পরিমিত অর্জ্জনে—কেবল ধনার্জ্জনের কথা বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তুমাত্রেরই অর্জ্জনের কথা বলিতেছি—কোন দোষ নাই। সেই পরিমিত মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই সদ্বৃত্তি লোভে পরিণত হইল। অনুচিত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা তখন মহাপাপ হইয়া দাঁড়াইল। দুইটি কথা বুঝ। যেগুলিকে আমরা নিকৃষ্টবৃত্তি বলি, তাহাদের সকলগুলিই উচিত মাত্রায় ধর্ম্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্ম্ম। আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজস্বিনী যে, যত্ন না করিলে এগুলি সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, এজন্য দমনই এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন। এই দুটি কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলনতত্ত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনই প্রকৃত অনুশীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে। মহাদেব, মন্মথের অনুচিত স্ফূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইল।* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, কৃষ্ণের যে

* মন্মথ ধ্বংস হইল, অথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না, এজন্য মন্মথের পুনর্জ্জীবন। পক্ষান্তরে আবার রতি কর্ত্তৃক পুনর্জ্জন্মলব্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন। এ কথাটাও যেন মনে থাকে। অনুচিত অনুশীলনেই অনুচিত স্ফূর্ত্তি। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির এইরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য অনুভূত করিতে পারিলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম আর উপধর্ম্মসঙ্কুল বা "silly" বলিয়া বোধ হইবে না। সময়ান্তরে দুই একটা উদাহরণ দিব।

উপদেশ তাহাতেও ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে। সংযত হইলে সে সকল আর শান্তির বিঘ্নকর হইতে পারে না, যথা

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ২। ৬৪।

শিষ্য। যাই হউক, এ তত্ত্ব লইয়া আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবৃত্তি সকলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। এ বিষয়ে এত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। দুই কারণে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম, তোমার আপত্তি খণ্ডন করিতে হইল। আর আজ কাল যোগ-ধর্ম্মের একটা হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। এই ধর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার যে সুমহৎ ফল আছে তাহাতে সন্দেহ কি? তবে যাঁহারা এই হুজুক লইয়া বেড়ান, তাঁহাদের মত এই দেখিতে পাই যে, কতকগুলি বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ, এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ—ইহাই যোগের উদ্দেশ্য। এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য ধর্ম্ম হয়, তবে তাঁহাদিগের এই ধর্ম্ম অধর্ম্ম। বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্ম্ম। লম্পট বা পেটুক অধার্ম্মিক, কেন না তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীরাও অধার্ম্মিক, কেন না তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, দুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তি ভেদে না হয় লম্পট বা উদরম্ভরীকে নীচ শ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম এবং যোগী-দিগকে উচ্চশ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম, কিন্তু উভয়কেই অধার্ম্মিক বলিব। আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব? জগদীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাঁহার কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা স্ব স্ব কার্য্যোপযোগী করিয়াছেন। কার্য্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু সে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য। আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই দোষে। জগত্তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই বুঝিব যে আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সম্বদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিরই অনুকূল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়। তাই যুগপরম্পরায় মনুষ্যজাতির

মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্ম্মই এই উন্নতির কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্ম্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না যে তাঁহার বিজ্ঞানও এই ধর্ম্মের এক অংশ, তিনিও এক জন ধর্ম্মের আচার্য্য। তিনি যখন "Law"র মহিমা কীর্ত্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম করি, দুই জন একই কথা বলি। দুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করি। মনুষ্য মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না।

সপ্তম অধ্যায়।—সামঞ্জস্য ও সুখ।

গুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্য্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল, সে সকলের কথা বলি শুন।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদি, অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের অধিক সম্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে সামঞ্জস্যের ধ্বংস। কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে সামঞ্জস্য, কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামঞ্জস্য, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপনি বলিয়াছেন যে, কামাদির অধিক স্ফুরণে, অন্যান্য বৃত্তি, যথা ভক্তি প্রীতি দয়া, এ সকলের উত্তম স্ফূর্ত্তি হয় না, এই জন্য অসামঞ্জস্য ঘটে। কিন্তু ভক্তি প্রীতি দয়াদির অধিক স্ফুরণেও কাম ক্রোধাদির উত্তম স্ফূর্ত্তি হয় না; ইহাতে অসামঞ্জস্য ঘটে না কেন?

গুরু। যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে সহজেই বুঝা যায় সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত—অনুশীলনসাপেক্ষ নহে। আমাদিগকে অনুশীলন করিয়া ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হয় না। দেখিও, স্বতঃস্ফূর্ত্তে ও সহজে গোল করিও না। যাহা আমাদের সঙ্গে জন্মিয়াছে তাহা সহজ। সকল বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাহা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহাই বা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইবে কেন?

গুরু। অনুশীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয়। (১) সময়, (২) শক্তি (Energy), (৩) যাহা লইয়া বৃত্তির অনুশীলন করিব—অনুশীলনের উপাদান। এখন, আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয় সঙ্কীর্ণ। মনুষ্যজীবন কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত। জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছু-মাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয় যে, যে বৃত্তি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলনসাপেক্ষ তাহার অনুশীলনে, সকল সময়টুকু দিব। যদি তাহা না করিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনাবশ্যক অনুশীলনে সময় হরণ করি, তবে সময়াভাবে অন্য বৃত্তিগুলির উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। কাজেই সে সকলের খর্ব্বতা বা বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তিটুকু আছে, তাহাও পরিমিত। জীবিকানির্ব্বাহের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় বেশী থাকে না। বিশেষ পাশব বৃত্তির সমধিক অনুশীলন, শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়ত, স্বতঃস্ফূর্ত্ত পাশব বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী। যেখানে ওগুলি থাকে, সেখানে এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাসিনীমণ্ডলমধ্যবর্ত্তীর হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব এবং ক্রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থীর সমাগম অসম্ভব। আর শেষ কথা এই যে, পাশব বৃত্তিগুলি শরীর ও জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া, পুরুষ-পরম্পরাগত স্ফূর্ত্তিজন্যই হউক, বা জীবরক্ষাভিলাষী ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী যে, অনুশীলনে তাহারা সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। এইটি বিশেষ কথা।

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও জীবিকানির্ব্বাহাবশিষ্ট শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির আবশ্যকীয় স্ফূর্ত্তির কোন বিঘ্ন হয় না। কেন না, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। কিন্তু উপাদানবিরোধহেতু, তাহাদের দমন হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, এ সকলের দমনই যথার্থ অনুশীলন।

শিষ্য। কিন্তু যোগীরা অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা—কিম্বা উপায়ান্তরের দ্বারা, পাশব বৃত্তিগুলির ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা কি সত্য নয়?

গুরু। চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় না, এমত নহে। কিন্তু সে ব্যবস্থা অনুশীলন ধর্ম্মের নহে, সন্ন্যাস ধর্ম্মের। সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম্ম বলি না—অন্তত

সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম। ভগবান স্বয়ং কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনুশীলন কর্ম্মাত্মক।

শিষ্য। যাক্। তবে আপনার সামঞ্জস্য তত্ত্বের স্থূল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম যে, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহা বাড়িতে দিতে পারি। কিন্তু ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রতিভা (Genius) কি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে? প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা আমি জানি। কিন্তু কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তিমতী বলিয়া তাহাকে কি বাড়িতে দিব না? তাহার অপেক্ষা আত্মহত্যা ভাল।

গুরু। ইহা যথার্থ।

শিষ্য। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন করিব? কোন্ কষ্টি-পাতরে ঘসিয়া ঠিক করিব যে, এইটি সোনা এইটি পিতল।

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষ্যত্বেই সুখ। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাতর।

শিষ্য। বড় ভয়ানক কথা! আমি যদি বলি, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা বলিতে পার না। কেন না, সুখ কি তাহা বুঝাইয়াছি। আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।

শিষ্য। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায় সুখ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। সমবায়ই সুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তি সুখের অংশ মাত্র।

শিষ্য। তবে কষ্টিপাতর কোন্‌টা? সমবায় না অংশ?

গুরু। সমবায়ই কষ্টিপাতর।

শিষ্য। এ ত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুন আমি ছবি আঁকিতে পারি। কতকগুলি বৃত্তিবিশেষের পরিমার্জ্জনে এ শক্তি জন্মে। কথাটা এই যে, সেই বৃত্তিগুলির সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্ত্তব্য কি না। আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন "সকল বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও চরিতার্থতার সমবায় যে সুখ, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে কি না, এ কথা বুঝিয়া তবে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন কর।" অর্থাৎ আমার তুলি ধরিবার আগে আমাকে গণনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর

স্বাস্থ্য, চক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রুতি—আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, দীনে দয়া, সত্যে অনুরাগ—আমার অপত্যে স্নেহ, শত্রুতে ক্রোধ,—আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক ধৃতি,—আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা—কোন দিকে কিছুর কোন বিঘ্ন হয় কি না। ইহাও কি সাধ্য?

গুরু। কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও। ধর্ম্মাচরণ ছেলেখেলা নহে। ধর্ম্মাচরণ অতি দুরূহ ব্যাপার। প্রকৃত ধার্ম্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল তাহার কারণই তাই। ধর্ম্ম সুখের উপায় বটে, কিন্তু সুখ বড় আয়াসলভ্য। সাধনা অতি দুরূহ। দুরূহ, কিন্তু অসাধ্য নহে।

শিষ্য। কিন্তু ধর্ম্ম ত সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হওয়া উচিত।

গুরু। ধর্ম্ম, যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, ত না হয়, তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম। ফরমায়েস মত জিনিস গড়িয়া দিতাম। কিন্তু ধর্ম্ম তোমার আমার গড়িবার নহে। ধর্ম্ম ঐশিক নিয়মাধীন। যিনি ধর্ম্মের প্রণেতা তিনি ইহাকে যেরূপ করিয়াছেন সেইরূপ আমাকে বুঝাইতে হইবে। তবে ধর্ম্মকে সাধারণের অনুপযোগীও বলা উচিত নহে। চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা সকলেই ধার্ম্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্ম্মিক হইবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক। আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে।

শিষ্য। আমি যদি বলি যে আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এবঞ্চ দুষ্প্রাপ্য সুখ মানি না, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, সুখের উপায় ধর্ম্ম নহে, সুখের উপায় অধর্ম্ম।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে? ইহাও বৃত্তির স্ফুরণ ও চরিতার্থতা বটে। আমি ইন্দ্রিয়গণকে খর্ব্ব করিয়া, কেন দয়া দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, আপনি তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই। আপনি ইহা বুঝাইয়াছেন বটে যে, ইন্দ্রিয়াদির অধিক অনুশীলনে দয়া দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনা—কিন্তু তদুত্তরে আমি যদি বলি যে ধ্বংস হউক, আমি ইন্দ্রিয়সুখে বঞ্চিত হই কেন?

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, তুমি কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াছ। যাহা হউক, তোমার কথার আমি উত্তর দিব। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি সুখ? ভাল, তাই

হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে অনুমতি দিতেছি। আমি খত লিখিয়া দিতেছি যে, এই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে না, কেহ নিন্দা করিবে না,—যদি কেহ করে আমি গুণাগারি দিব। কিন্তু তোমাকেও একখানি খত লিখিয়া দিতে হইবে। তুমি লিখিয়া দিবে যে, "আর ইহাতে সুখ নাই" বলিয়া তুমি ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। শ্রান্তি, ক্লান্তি, রোগ, মনস্তাপ, আয়ুক্ষয়, পশুত্বে অধঃপতন প্রভৃতি কোনরূপ ওজর আপত্তি করিয়া ইহা কখন ছাড়িতে পারিবে না। কেমন রাজি আছ?

শিষ্য। দোহাই মহাশয়ের! আমি নই। কিন্তু এমন লোক কি সর্ব্বদা দেখা যায় না, যাহারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই সার করে? অনেক লোকই ত এইরূপ?

গুরু। আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক। কিন্তু ভিতরের খবর রাখি না। ভিতরের খবর এই—যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই চেষ্টা এত প্রবল। অনুশীলনের দোষে, হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে,—দাহ নিবারণের জন্য তারা জল খুঁজিয়া বেড়ায়; জানে না যে অগ্নিদগ্ধের ঔষধ জল নয়।

শিষ্য। কিন্তু এমনও দেখি যে অনেক লোক অবাধে অনুক্ষণ ইন্দ্রিয়বিশেষ চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই। মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। অনেক মাতাল আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মদ খায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই, তাহারা ত মদ ছাড়ে না—ছাড়িতে চায় না।

গুরু। একে একে বাপু। আগে "ছাড়ে না" কথাটাই বুঝ। ছাড়ে না, তাহার কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না। ছাড়িতে পারে না, কেন না এটি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির লালসা মাত্র নহে—এ একটি পীড়া। ডাক্তারেরা ইহাকে Dipsomania বলেন। ইহার ঔষধ আছে—চিকিৎসা আছে। রোগী মনে করিলেই রোগ ছাড়িতে পারে না। সেটা চিকিৎসকের হাত। চিকিৎসা নিষ্ফল হইলে রোগের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাহা ঘটে;—মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই। "ছাড়িতে চায় না"—এ কথা সত্য নয়। যে মুখে যাহা বলুক, তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মদ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে এক দিন মদ খায়, সেই আজিও বলে "মদ

ছাড়িব কেন?" তাহার মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই—তৃষ্ণা বলবতী আছে। কিন্তু যাহার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝি আর নাই। এ সকল কথা মদ্যপ সম্বন্ধেই যে খাটে, এমত নহে। সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অনুচিত অনুশীলনের ফলও একটি রোগ। তাহারও চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকালমৃত্যু আছে। এইরূপ একটি রোগীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিলাম যে, তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে না পারে, এ জন্য লাইকরলিটি দিয়া তাহার অঙ্গের স্থানে স্থানে ঘা করিয়া দিতে হইয়াছিল। ঔদরিকের কথা সকলেই জানে। আমার নিকট এক জন ঔদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ঔদরিকতার অনুচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তি জন্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে দুষ্পচনীয় দ্রব্য আহার করিলেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে। সে জন্য লোভ সম্বরণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাপু হে! এই সকল কি সুখ? ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই?

শিষ্য। এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বলিতেছেন তাহা বুঝিয়াছি। ক্ষণিক যে সুখ তাহা সুখ নহে।

গুরু। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপ ফুল দেখি, কি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্তু সে সুখ কি সুখ নহে? তাহা সত্যই সুখ।

শিষ্য। যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী দুঃখ, তাহা সুখ নহে, দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। এখন বুঝিয়াছি কি?

গুরু। এখন পথে আসিয়াছ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। কেবল ব্যতিরেকী ব্যাখ্যায় সবটুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে—

শিষ্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন কোন ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয়-সুখভোগ করিতেছে। কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক?

গুরু। প্রথমত, সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মুহূর্ত্ত মাত্র। তুমি পরকাল মান, না মান, আমি মানি। অনন্ত কালের তুলনায় পাঁচ বৎসর কতক্ষণ? কিন্তু আমি

পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও ধার্ম্মিক করিতে চাহি না। কেন না অনেক লোক পরকাল মানে না—মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না, মনে করে ছেলেদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে শান্ত করিবার একটা প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আজি কালি অনেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের দুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহা এই জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্ব্বত্র বলবান্ হয় না। "আজিকার দিনে" বলিতেছি, কেন না এক সময়ে এদেশে সে ধর্ম্ম বড় বলবান্ই ছিল বটে। এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান্ ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী ঊনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্ত-মাংস-পূতিগন্ধ-শালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচ্‌লোডর-টর্পীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী,—এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তাহা ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ার মুখী, এদেশে আসিয়াও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া, তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্ম্মব্যাখ্যায় যত পারি পরকালকে বাদ দিতেছি। তাহার কারণ এই যে, যাহা তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্ম্মের মন্দির গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম্ম ভিত্তিশূন্য হইল না। কেন না, ইহলোকের সুখও কেবল ধর্ম্মমূলক, ইহকালের দুঃখও কেবল অধর্ম্মমূলক। এখন, ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। এজন্য ইহকালের সুখ দুঃখের উপরও ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই দুই কারণে, অর্থাৎ ইহকাল সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং পরকাল সর্ব্ববাদিসম্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল ইহকালের উপরই ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। কিন্তু "স্থায়ী সুখ কি?" যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে হয় যে, অনন্তকালস্থায়ী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে।

শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একটা কথার মীমাংসা করুন। মনে করুন, বিচারার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা সুখ, পরকালেও কি তাই সুখ? ইহকালে যাহা দুঃখ, পরকালেও কি তাই দুঃখ? আপনি বলিতেছেন, ইহকালপরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ—এক জাতীয় সুখ কি উভয়কালব্যাপী হইতে পারে?

গুরু। অন্য প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি। কিন্তু এ কথার উত্তর জন্য দুই প্রকার বিচার আবশ্যক। যে জন্মান্তর মানে তাহার পক্ষে এক প্রকার, আর যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে আর এক প্রকার। তুমি কি জন্মান্তর মান?

শিষ্য। না।

গুরু। তবে, আইস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে অথচ জন্মান্তর মানিলে না, তখন দুইটি কথা স্বীকার করিলে;—প্রথম, এই শরীর থাকিবে না, সুতরাং শারীরিকী বৃত্তিনিচয়জনিত যে সকল সুখ দুঃখ তাহা পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয়, শরীর ব্যতিরিক্ত যাহা তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং মানসিক বৃত্তিজনিত যে সকল সুখ দুঃখ তাহা পরকালেও থাকিবে। পরকালে এইরূপ সুখের আধিক্যকে স্বর্গ বলা যাইতে পারে, এইরূপ দুঃখের আধিক্যকে নরক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্ম্মব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্য অন্যান্য ধর্ম্মব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে। আপনি পরকাল মানিয়াও যে উহা ধর্ম্মব্যাখ্যায় বর্জ্জিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা করি।

গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ হউক বা না হউক কিন্তু ভ্রান্ত নহে। কেন না সুখের উপায় যদি ধর্ম্ম হইল, আর ইহকালের যে সুখ, পরকালেও যদি সেই সুখই সুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধর্ম্ম, পরকালেরও সেই ধর্ম্ম। পরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ধার্ম্মিক হওয়া যায়। ধর্ম্ম নিত্য। ধর্ম্ম ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ। তুমি পরকাল মান আর না মান—ধর্ম্মাচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, পরকালেও সুখী হইবে।

শিষ্য। আপনি নিজে পরকাল মানেন—কিছু প্রমাণ আছে বলিয়া মানেন, না, কেবল মানিতে ভাল লাগে তাই মানেন?

গুরু। যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে বলিয়াই পরকাল মানি।

শিষ্য। যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বাসী, তবে আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ বুঝাইতেছেন না কেন?

গুরু। আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সে প্রমাণগুলি বিবাদের স্থল। প্রমাণগুলির এমন কোন দোষ নাই যে, সে সকল বিবাদের সুমীমাংসা হয় না, বা হয় নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার বশত বিবাদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন নাই, এই জন্য বলিতেছি যে, আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধর্ম্মাত্মা হও। ইহাই যথেষ্ট। আমরা এই ধর্ম্মব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব যে, এক্ষণে যাহাকে সমুদয় চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিত্রতা —চিত্তশুদ্ধি।* তুমি পরকাল যদি নাও মান তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে সুখী হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হইল, তখন পরলোকে স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মানা না মানাতে বড় আসিয়া গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষে সহজ হইল; যে ধর্ম্ম তাহারা পরকালমূলক বলিয়া এত দিন অগ্রাহ্য করিত, তাহারা এখন সেই ধর্ম্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে। আর যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে, তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হউক, বরং ইহাই আমি কামনা করি।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন যে ইহকাল-পরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ। একজাতীয় সুখ উভয় কালব্যাপী হইতে পারে। যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে এই তত্ত্ব যে কারণে গ্রাহ্য, তাহা বুঝাইলেন। যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে কি?

গুরু। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ। অনুশীলনের পূর্ণমাত্রায় আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। ভক্তিতত্ত্ব যখন বুঝাইব, তখন এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে।

শিষ্য। কিন্তু অনুশীলনের পূর্ণমাত্রা ত সচরাচর কাহার কপালে ঘটা সম্ভব নহে। যাহাদের অনুশীলনের সম্পূর্ণতা ঘটে নাই, তাহাদের পুনর্জ্জন্ম ঘটিবে। এই জন্মের অনুশীলনের ফলে তাহারা কি পরজন্মে কোন সুখ প্রাপ্ত হইবে?

গুরু। জন্মান্তরবাদের স্থূল মর্ম্মই এই যে এ জন্মের কর্ম্মফল পরজন্মে পাওয়া যায়। সমস্ত কর্ম্মের সমবায় অনুশীলন। অতএব এ জন্মের অনুশীলনের যে শুভফল তাহা অনুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ কথা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

---

* সকল কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইবে।

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্" ইত্যাদি।

গীতা। ৪৩। ৬।

শিষ্য। এক্ষণে আমরা স্থূল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী সুখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, ইহকালে ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ। ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর কি?

গুরু। দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য। ইহজীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অন্ত হইল, তাহা হইলে, যে সুখ সেই অন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ। যদি পরকাল না থাকে, তবে ইহজীবনে যাহা চিরকাল থাকে তাহাই স্থায়ী সুখ। তুমি বলিতেছিলে, পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে। যে পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। তিনটির একটি না একটি কারণে অবশ্য অবশ্য, তাহার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। (১) অতিভোগজনিত গ্লানি বা বিরাগ—অতিতৃপ্তি; কিম্বা (২) ইন্দ্রিয়াসক্তিজনিত অবশ্যম্ভাবী রোগ বা অসামর্থ্য; অথবা (৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এ সকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে।

শিষ্য। আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলা যায়, সেগুলির অনুশীলনে যে সুখ, তাহা কি ইহজীবনে চিরস্থায়ী?

গুরু। তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, দয়া বৃত্তির কথা হইতেছে। পরোপকারে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা। এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আরম্ভ করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ইহা যে অনুশীলিত করিয়াছে, সে জানে দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে, এমন তীব্র সুখ আছে যে, নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঐন্দ্রিয়িকেরা সর্ব্বলোকসুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভূত করিতে পারে না। এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার সুখজনকতা বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃত্তির ন্যায়, ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য বা দৌর্ব্বল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে। ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। ঔদরিক দিবসে দুই বার, তিন বার, না হয় চারি বার আহার করিতে

পারে। অন্যান্য ঐন্দ্রিয়িকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, পলকে পলকে করা যায়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার অনুশীলন চলে। অনেক লোক মরণকালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, ধার্ম্মিক (Christian) কেমন সুখে মরে!"

তার পর, পরকালের কথা বলি। যদি জন্মান্তর না মানিয়া পরকাল স্বীকার করা যায়, তবে ইহা বলিতে হইবে যে, পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং এ দয়া বৃত্তিটিও থাকিবে। আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয়া যাইব, পারলৌকিক প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব, কেন না হঠাৎ অবস্থান্তরের উপযুক্ত কোন কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা উত্তমরূপে অনুশীলিত ও সুখপ্রদ অবস্থায় লইয়া যাই, তবে উহা পরলোকেও আমার পক্ষে সুখপ্রদ হইবে। সেখানে আমি ইহা অনুশীলিত ও চরিতার্থ করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব।

শিষ্য। এ সকল সুখ-স্বপ্ন মাত্র—অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতা কর্ম্মাধীন। পরোপকার কর্ম্মমাত্র। আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি, আমি শরীরের সঙ্গে এখানে রাখিয়া গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কর্ম্ম করিব?

গুরু। কথাটা কিছু নির্ব্বোধের মত বলিলে। আমরা ইহাই জানি যে, যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের কর্ম্ম কর্ম্মেন্দ্রিয়সাধ্য। কিন্তু যে চৈতন্য শরীরে বদ্ধ নহে, তাহারও কর্ম্ম যে কর্ম্মেন্দ্রিয়সাপেক্ষ, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

শিষ্য। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্যস্য নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং। কর্ম্ম অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্য। কোথাও আমরা দেখি নাই যে কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য যে, সে কর্ম্ম করিয়াছে।

গুরু। ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরসা করি; তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও স্বীকার কর। যদি তাহা কর, তবে কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য নিরাকারের কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে। কেন না, ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বস্রষ্টা।

পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র। অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন না হওয়াই সম্ভব।

শিষ্য। হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথা। আন্দাজি কথার প্রয়োজন নাই।

গুরু। আন্দাজি কথা ইহা আমি স্বীকার করি। বিশ্বাস করা, না করার পক্ষে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া আসি নাই, ইহা বোধ করি বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথার একটু মূল্য আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি Law of Continuity অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমান্বয় ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখিতেছি না। এই ক্রমান্বয় ভাবটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে। হিন্দু, খৃষ্টীয়, বা ইস্‌লামী যে স্বর্গনরক, তাহা এই নিয়মের বিরুদ্ধ।

শিষ্য। যদি পরকাল মানিতে পারি তবে এটুকুও না হয় মানিয়া লইব। যদি হাতীটা গিলিতে পারি, তবে হাতীর কাণের ভিতর যে মশাটা ঢুকিয়াছে, তাহা গলায় বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের শাসনকর্তৃত্ব কই?

গুরু। যাহারা স্বর্গের দণ্ডধর গড়িয়াছে, তাহারা পরকালের শাসনকর্ত্তা গড়িয়াছে। আমি কিছুই গড়িতে বসি নাই। আমি মনুষ্যজীবনের সমালোচনা করিয়া, ধর্ম্মের যে স্থূল মর্ম্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই। যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশালা ছাড়িল, সেই দিনই একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রহিল। আর যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সদ্‌বৃত্তিগুলি মার্জ্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহার অনন্ত সুখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব। আর যে সদ্‌বৃত্তিগুলির অনুশীলন অভাবে অপক্কাবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে কোন সুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর যে কেবল অসদ্‌বৃত্তিগুলি স্ফুরিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ। জন্মান্তর যদি না মানা যায়, তবে এইরূপ স্বর্গ নরক মানা যায়। কৃমি-কীট-সঙ্কুল অবর্ণনীয় হ্রদরূপ নরক বা অপ্সরোকণ্ঠ-নিনাদ-মধুরিত,

উর্ব্বশী মেনকা রম্ভাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দন-কানন-কুসুম-সুবাস সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি না। হিন্দুধর্ম্ম মানি, হিন্দুধর্ম্মের "বখামি"গুলা মানি না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি।

শিষ্য। আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহকাল লইয়া সুখের যে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার সূত্র পুনর্গ্রহণ করুন।

গুরু। বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব, যে পরকাল বাদ দিয়া কথা কহিলেও, কোন কোন সুখকে স্থায়ী কোন কোন সুখের স্থায়িত্বাভাবে তাহাকে ক্ষণিক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। বোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি নাই। আমি একটা টপ্পা শুনিয়া আসিলাম, কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। তাহাতে কিছু আনন্দ লাভও করিলাম। সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক ?

গুরু। যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী সুখ। সেই স্থায়ী সুখের অংশ বা উপাদান বলিয়া, ঐ আনন্দটুকুকে স্থায়ী সুখের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। সুখ যে বৃত্তির অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এখন বলিয়াছি যে, কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলনজনিত যে সুখ, তাহা অস্থায়ী। শেষোক্ত সুখও আবার দ্বিবিধ; (১) যাহার পরিণামে দুঃখ, (২) যাহা ক্ষণিক হইলেও পরিণামে দুঃখশূন্য। ইন্দ্রিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা অবশ্য বুঝিয়াছ যে, এই বৃত্তিগুলির পরিমিত অনুশীলনে দুঃখশূন্য সুখ, এবং এই সকলের অসমুচিত অনুশীলনে যে সুখ, তাহারই পরিণাম দুঃখ। অতএব সুখ ত্রিবিধ।

(১) স্থায়ী।

(২) ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য।

(৩) ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ।

শেষোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়,—উহা দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে, (১) হয় যাহা স্থায়ী (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে দুঃখশূন্য। আমি যখন বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম, তখন এই অর্থেই সুখ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহা বস্তুত দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভ্রান্ত

বা পশুবৃত্তদিগের মতাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরে, জলের স্নিগ্ধতাবশত তাহার প্রথম নিমজ্জন কালে কিছু সুখোপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থা তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জন দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। তেমনি দুঃখপরিণাম সুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা—নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে।

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, "এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন করিব? কোন্ কষ্টিপাতরে ঘষিয়া ঠিক করিব যে, এইটি পিতল?" এই প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া গেল। যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে অধিক বাড়িতে দেওয়াই কর্ত্তব্য—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর যেগুলির অনুশীলনে ক্ষণিক সুখ তাহা বাড়িতে দেওয়া অকর্ত্তব্য, কেন না, এ সকল বৃত্তির অধিক অনুশীলনের পরিণাম সুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অনুশীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহা অবিধেয় নহে—কেন না তাহাতে পরিণামে দুঃখ নাই। তার পর আর নহে। অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ; যেরূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাতর।

অষ্টম অধ্যায়।—শারীরিকী বৃত্তি।

শিষ্য। যে পর্য্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, অনুশীলন কি। আর বুঝিয়াছি সুখ কি। বুঝিয়াছি অনুশীলনের উদ্দেশ্য সেই সুখ; এবং সামঞ্জস্য তাহার সীমা। কিন্তু বৃত্তিগুলির অনুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ কিছু এখনও পাই নাই। কোন্ বৃত্তির কি প্রকার অনুশীলন করিতে হইবে তাহার কিছু উপদেশের প্রয়োজন নাই কি?

গুরু। ইহা শিক্ষাতত্ত্ব। শিক্ষাতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্গত। আমাদের এই কথাবার্ত্তার প্রধান উদ্দেশ্য তাহা নহে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে ধর্ম্ম কি তাহা বুঝি। তজ্জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আমি বলিব।

বৃত্তি চতুর্ব্বিধ বলিয়াছি; (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জ্জনী, (৩) কার্য্যকারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জিনী। আগে শারীরিকী বৃত্তির কথা বলিব—কেন না, উহাই সর্ব্বাগ্রে স্ফুরিত হইতে থাকে। এ সকলের স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে সুখ আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

শিষ্য। তাহার কারণ বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম্ম কেহ বলে না।

গুরু। কোন কোন ইউরোপীয় অনুশীলনবাদী বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মস্থানীয় কোন একটা জিনিস বিবেচনা করেন, কিন্তু তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়।*

শিষ্য। আপনি কেন বলেন?

গুরু। যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম্ম। কিন্তু সে কথা না হয় ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম বল; যদি দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারকে ধর্ম্ম বল; যদি কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম্ম বল; না হয় খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লামধর্ম্মকে ধর্ম্ম বল, সকল ধর্ম্মের জন্যই শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। ইহা কোন ধর্ম্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের বিঘ্ননাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্ম্মবেত্তা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

শিষ্য। ধর্ম্মের বিঘ্ন বা কিরূপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহার বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া দিন।

গুরু। প্রথম ধর, রোগ। রোগ ধর্ম্মের বিঘ্ন। যে গোঁড়া হিন্দু রোগে পড়িয়া আছে, সে যাগযজ্ঞ, ব্রতনিয়ম, তীর্থদর্শন, কিছুই করিতে পারে না। যে গোঁড়া হিন্দু নয়, কিন্তু পরোপকার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্ম্মের বিঘ্ন। রোগে যে নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্য্য করিবে? যাহার বিবেচনায় ধর্ম্মের জন্য এ সকল কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম্ম, রোগ তাহারও ধর্ম্মের বিঘ্ন। কেন না রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না; অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না; কেন না চিত্তকে শারীরিক যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে। রোগ কর্ম্মীর কর্ম্মের বিঘ্ন, যোগীর যোগের বিঘ্ন, ভক্তের ভক্তির সাধনের বিঘ্ন। রোগ ধর্ম্মের পরম বিঘ্ন।

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে, শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবই প্রধানতঃ রোগের কারণ।

---

* Herbert Spencer বলেন। গ চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ।

শিষ্য। যে হিম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল তাহাও কি অনুশীলনের অভাব?

গুরু। ত্বগিন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের ব্যাঘাত। শারীরতত্ত্ব বিদ্যাতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার থাকিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। তবে দেখিতেছি যে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলন না হইলে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন হয় না।

গুরু। না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনুশীলনের সাপেক্ষ। কেবল শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ, এমত নহে। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তৎসাপেক্ষ। কোন্ কার্য্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন্ বৃত্তির কিসে অনুশীলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

শিষ্য। এখন থাকিলে চলিবে না। যদি বৃত্তিগুলির অনুশীলন পরস্পর সাপেক্ষ, তবে কোন্গুলির অনুশীলন আগে আরম্ভ করিব?

গুরু। সকলগুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে; অর্থাৎ শৈশবে।

শিষ্য। আশ্চর্য্য কথা। শৈশবে আমি জানি না যে, কি প্রকারে কোন বৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব?

গুরু। এই জন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক। শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এই জন্য হিন্দুধর্ম্মে গুরুর এত মান। আর গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না। ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথা যখন বলিব, তখন এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলি।

(২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষতা হইতে শারীরিকী বৃত্তি অনুশীলনের দ্বিতীয় প্রয়োজন, অথবা ধর্ম্মের দ্বিতীয় বিঘ্নের কথা পাওয়া যায়। যদি অন্যান্য বৃত্তিগুলি শারীরিক বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে জ্ঞানার্জ্জনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের জন্য শারীরিকী বৃত্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলন চাই। বাস্তবিক, ইহা প্রসিদ্ধ যে শারীরিক

শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকিলে মানসিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা অসম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা শরীর ও মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে কালেজি শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে ইহাতে শিক্ষার্থীদিগের শারীরিক স্ফূর্ত্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানসিক অধঃপতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে; কাজে কাজেই ধর্ম্মেরও অধোগতি ঘটে।

(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ত্ব, বা তৃতীয় বিঘ্ন আরও গুরুতর। যাহার শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ কোথায়? সকলেরই শত্রু আছে। দস্যু আছে। ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন করে। তদ্ভিন্ন অনেক সময়ে যে বলে শত্রুদমন করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধর্ম্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন অলঙ্ঘনীয় যে পরম ধার্ম্মিকও এমন অবস্থায় অধর্ম্ম অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাভারতকার, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা করিয়াছেন। বলে দ্রোণাচার্য্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়া যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পরম ধার্ম্মিকও মিথ্যা প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে খাটিতে পারে, কিন্তু এখনকার সভ্য সমাজে রাজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া তাদৃশ প্রয়োজনীয়?

গুরু। রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। পারিলে এত খুন, জখম, চুরি ডাকাতি, দাঙ্গা মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। পুলিসের বিজ্ঞাপন সকল পড়িলে জানিতে পারিবে যে, যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাও তোমার বুঝা কর্ত্তব্য। যখন তোমাকে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কথা বলিব, তখন বুঝিবে যে আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, আপনার স্ত্রীপুত্র পরিবার স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও

তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। যে ইহা করে না, সে পরম অধার্ম্মিক। অতএব যাহার তদুপযোগী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধার্ম্মিক।

(৪) আত্মরক্ষা, বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্ম্মের চতুর্থ বিঘ্নের কথা উঠিতেছে। এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুতর; ধর্ম্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্ম্মের জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত, প্রাণ কি, সর্ব্বসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার কথা বলিতেছি।

যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম্ম। সমাজস্থ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্ব্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্ম্মের শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশাসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে, সে তার কাড়িয়া খায়। তেমনি, বিবিধ সমাজের উপর কেহ এক জন রাজা না থাকাতে, যে সমাজ বলবান্, সে দুর্ব্বল সমাজের কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। আজ ফ্রান্স জর্ম্মানির কাড়িয়া খাইতেছে, কাল জর্ম্মানি ফ্রান্সের কাড়িয়া খাইতেছে; আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়া খায়, কাল রূস তুর্কের কাড়িয়া খায়। আজ Rhenish Frontier, কাল পোলণ্ড, পরশু বুল্‌গেরিয়া, আজ মিশর, কাল টঙ্কুইন। এই সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমন হাটের কুকুরেরা যে যার পায় সে তার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য জাতি তেমনি পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়। দুর্ব্বল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্ব্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম্ম, কেন না এস্থলে আপন ও পর, উভয়ের রক্ষার কথা।

সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্ম্মের উপযোগী আর কতকগুলি অনুপযোগী। কতকগুলি অবস্থা সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির অনুকূল। আবার কোন কোন সামাজিক অবস্থা কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির প্রতিকূল। অধিকাংশ সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেষ্টাণ্টদিগকে রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ; ঔরঙ্গজেবের হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষ আর একটি উৎপীড়ন। সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা

বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি। লিবর্টি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ধর্ম্মোন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন তাহা সকলেরই কর্ত্তব্য।

শিষ্য। অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই ?

গুরু। তাহার অর্থ এমন নহে যে সকলকে যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু সকলের প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয় যে, বৃহৎ রাজ্য সে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে সকলকেই এই জন্য যুদ্ধ করিতে হইত। বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে, যুদ্ধ শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতেরা ইহার উদাহরণ। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্ত্তৃক বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষা থাকে না। ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবামাত্র, ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য জাতি সকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে দুর্দ্দশা হইত না। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্ত্রধারণ করিয়া সমবেত ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল। যদি তাহা না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় দুর্দ্দশা হইত।

শিষ্য। কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে ?

গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্য ব্যায়াম চাই। এদেশে, ডন, কুস্তী, মুগুর প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ইংরেজি সভ্যতা শিখিতে গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের বর্ত্তমান বুদ্ধিবিপর্য্যয়ের ইহা একটি উদাহরণ।

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ অস্ত্রশিক্ষা। সকলেরই সর্ব্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত।

শিষ্য। কিন্তু এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ।

গুরু। সেটা একটা আইনের ভুল। আমরা মহারাণীর রাজভক্ত প্রজা, আমরা অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিব ইহাই বাঞ্ছনীয়। আইনের ভুল পশ্চাৎ সংশোধিত হইতে পারে।

তার পর তৃতীয়তঃ অস্ত্রশিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণ জন্য প্রয়োজনীয়। যথা অশ্বারোহণ। ইউরোপে যে অশ্বারোহণ করিতে পারে না এবং যাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাসাস্পদ। বিলাতী স্ত্রীলোকদিগেরও এ সকল শক্তি হইয়া থাকে। আমাদের কি দুর্দ্দশা।

অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্ম্মশিক্ষা, পদব্রজে দূরগমন এবং সন্তরণও তাদৃশ। যোদ্ধার পক্ষে ইহা নহিলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় এমন বিবেচনা করিও না। যে সাঁতার না জানে সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপটু। যুদ্ধে কেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও পরের রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় এমন নহে, আক্রমণ, নিষ্ক্রমণ, ও পলায়ন জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পদব্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা বাহুল্য। মনুষ্য মাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। অতএব যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্ট ও বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে সুপটু—

গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মল্লযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। আত্মরক্ষার ও পরোপকারের বিশেষ অনুকূল।*

শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপুষ্টি, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, পদব্রজে দূরগমন—

গুরু। আরও চাই সহিষ্ণুতা। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি সকলই সহ্য করিতে পারা চাই। ইহা ভিন্ন যুদ্ধার্থীর আরও চাই। প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে পারিবে—ঘর বাঁধিতে পারিবে—মোট বহিতে পারিবে। অনেক সময়ে যুদ্ধার্থীকে দশ বার দিনের খাদ্য আপনার পিঠে বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। স্থূল কথা, যে কর্ম্মকার আপনার কর্ম্ম জানে সে যেমন অস্ত্রখানি তীক্ষ্ণধার ও শাণিত করিয়া, সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে, দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে—যেন তদ্দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয়।

* লেখক-প্রণীত দেবী চৌধুরাণী নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। এজন্য সে স্ত্রীলোক হইলেও তাহাকে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে।

শিষ্য। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে?

গুরু। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (৪) ইন্দ্রিয়সংযম। চারিটিই অনুশীলন।

শিষ্য। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন শুনিয়াছি। কিন্তু আহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কাঁচকলা ভাতে ভাতের কথাটা স্মরণ করুন। ততটুকু মাত্র আহার করাই কি ধর্ম্মানুমত? তাহার বেশী আহার কি অধর্ম্ম? আপনি ত এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

গুরু। আমি বলিয়াছি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক কামনা করা অধর্ম্ম। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন, ধর্ম্মোপদেষ্টার সে কাজ নহে। বোধ করি তাঁহারা বলিবেন যে কাঁচকলা ভাতে ভাত শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নহে। কেহ বা বলিতে পারেন, বাচস্পতির ন্যায়, যে ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, তাহার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই—বৈজ্ঞানিকের কর্ম্ম বৈজ্ঞানিক করুক। আহার সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ—যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত—গীতা হইতে তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮।১৭

যে আহার আয়ুর্বৃদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, সুখ বা চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধিকারক, এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার সারাংশ দেহে থাকিয়া যায় (অর্থাৎ Nutritious) এবং যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই সাত্ত্বিকের প্রিয়।

শিষ্য। ইহাতে মদ্য, মাংস, মৎস্য বিহিত না নিষিদ্ধ হইল?

গুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্য্য। শরীরতত্ত্ববিদ্ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিও যে, ইহা আয়ু সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতিবর্দ্ধন, ইত্যাদি গুণযুক্ত কি না।

শিষ্য। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ত এ সকল নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

গুরু। আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎসকের আসনে অবতরণ করা ধর্ম্মোপদেশকের বা ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মদ্য, মাংস, মৎস্য নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন বলিতেও পারি না। বরং অনুশীলনতত্ত্ব তাঁহাদের

বিধি সকলের মূল ছিল, তাহা বুঝা যায়। মদ্য যে অনিষ্টকারী, অনুশীলনের হানিকর, এবং যাহাকেই তুমি ধর্ম্ম বল, তাহারই বিঘ্নকর, এ কথা বোধঙ্করি তোমাকে কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না। মদ্য নিষেধ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ভালই করিয়াছেন।

শিষ্য। কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহার্য্য নহে?

গুরু। যে পীড়িত ব্যক্তির পীড়া মদ্য ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে, বা অন্য দেশে শৈত্যাধিক্য নিবারণ জন্য ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদকালে ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে—ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকট নহে। কিন্তু একটি এমন অবস্থা আছে যে সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না করিয়া পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার।

শিষ্য। এমন কি অবস্থা আছে?

গুরু। যুদ্ধ। যুদ্ধকালে মদ্য সেবন করা ধর্ম্মানুমত বটে। তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তিতে যুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মদ্য সেবনে সে সকলের বিশেষ স্ফূর্ত্তি জন্মে। এ কথা হিন্দুধর্ম্মের অননুমোদিত নহে। মহাভারতে আছে যে জয়দ্রথ বধের দিন, অর্জ্জুন একাকী ব্যূহ ভেদ করিয়া শত্রু সেনা মধ্যে প্রবেশ করিলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত দিন তাঁহার কোন সম্বাদ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাত্যকি ভিন্ন আর কেহই এমন বীর ছিল না, সে ব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে যায়। এ দুষ্কর কার্য্যে যাইতে যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে অনুমতি করিলেন। তদুত্তরে সাত্যকি উত্তম মদ্য চাহিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মদ্য দিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে পড়া যায় যে, স্বয়ং কালিকা অসুর বধকালে সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে চিন্‌হটের যুদ্ধে ইংরেজসেনা হিন্দু মুসলমান কর্ত্তৃক পরাভূত হয়। স্বয়ং Sir Henry Lawrence সে যুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক সর জন কে ইহার একটি কারণ এই নির্দ্দেশ করেন যে ইংরেজসেনা সে দিন মদ্য পায় নাই। অসম্ভব নহে।

যাই হৌক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার, (২) পীড়াদিতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্য কোন সময় সেবন করা অবিধেয়।

শিষ্য। মৎস্য মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত?

গুরু। মৎস্য মাংস শরীরের অনিষ্টকারী এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং উপকারী হইতে পারে। কিন্তু সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে। ধর্ম্মবেত্তার বক্তব্য এই যে মৎস মাংস, প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কিয়ৎপরিমাণে বিরোধী। সর্ব্বভূতে প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব। অনুশীলনতত্ত্বেও তাই। অনুশীলন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত—ভিন্ন নহে। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। মৎস্য মাংস বর্জ্জিত করিলে শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি রোধ হয় কি না? এ কথা বিজ্ঞানবিদের বিচার্য্য। কিন্তু যদি বিজ্ঞানশাস্ত্র বলে যে, সমুচিত স্ফূর্ত্তি রোধ হয় বটে তাহা হইলে প্রীতিবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইল। এমত অবস্থায় মৎস্য মাংস ব্যবহার্য্য। কথাটা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মোপদেষ্টার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ করা উচিত নহে, পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং (৩) আহারের কথা বলিলাম, এক্ষণে (৪) ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধেও একটা কথা বলা আবশ্যক। শারীরিক বৃত্তির সদনুশীলনজন্য ইন্দ্রিয় সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করি বুঝাইতে হইবে না। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, শিক্ষা নিষ্ফল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহার পরিপাকও হয় না। আর ইন্দ্রিয়ের সংযমই যে ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাও তোমাকে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতে বলি যে ইন্দ্রিয় সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা ঘটে না। অতএব যেমন ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছ যে, মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে, তেমনি এখন দেখিতেছ যে শারীরিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট; একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের অভাব ঘটে। অতএব যে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কথিত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না। এবং কতকগুলা বহি পড়িলে পণ্ডিত হয় না। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এই প্রথাটা বড় অনিষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছে।

নবম অধ্যায়।—জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি।

শিষ্য। শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, তাহা এই যে, অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এ সকল বৃত্তির অনুশীলনে সুখ, ইহাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন এবং জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইবে।

গুরু। ইহা প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপার্জ্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করা যায় না। শারীরিক বৃত্তির উদাহরণদ্বারা ইহা বুঝাইয়াছি। ইহা ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে। তাহা বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না। ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করা যায় না।

শিষ্য। তবে কি মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই? ঈশ্বর কি কেবল পণ্ডিতের জন্য?

গুরু। মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই। মূর্খের ধর্ম্ম নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতে যত জ্ঞানকৃত পাপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মূর্খের কৃত। তবে একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া দিই। যে লেখা পড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আর যে লেখা পড়া করিয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান, পুস্তকপাঠভিন্ন অন্য প্রকারে উপার্জ্জিত হইতে পারে; জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে। আমাদের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। তাঁহারা প্রায় কেহই লেখা পড়া জানিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের মত ধার্ম্মিকও পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু তাঁহারা বহি না পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে জ্ঞানোপার্জ্জনের কতকগুলি উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কথকতা ইহার মধ্যে একটি। প্রাচীনারা কথকের মুখে পুরাণেতিহাস শ্রবণ করিতেন। পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার নিহিত আছে। তচ্ছ্রবণে তাঁহাদিগের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকল পরিমার্জ্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত। তদ্ভিন্ন আমাদিগের দেশে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্যে পুরুষপরম্পরায় একটি অপূর্ব্ব জ্ঞানের স্রোত চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহারা তাহার অধিকারিণী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাঁহারা শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় ভাল বুঝিতেন। উদাহরণস্বরূপ অতিথি-সৎকারের কথাটা ধর। অতিথিসৎকারের মাহাত্ম্য জ্ঞানলভ্য; জাগতিক সত্যের সঙ্গে ইহা সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অতিথির নামে জ্বলিয়া উঠেন; ভিখারী দেখিলে লাঠি দেখান। কিন্তু যে জ্ঞান ইহাদের নাই, প্রাচীনাদের ছিল; তাঁহারা

অতিথিসৎকারের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সে সকল বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানী, এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অজ্ঞানী, ইহাই বলিতে হইবে।

শিষ্য। ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ হয় ইংরেজি শিক্ষাপ্রণালীর দোষ।

গুরু। সন্দেহ নাই। আমি যে অনুশীলনতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইলাম অর্থাৎ সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ব্বক অনুশীলন করিতে হইবে, এই কথাটি না বুঝাই এ দোষের কারণ।

কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য, এরূপ লোক-প্রতীতি আছে, এবং তদনুরূপ কার্য্য হইতেছে। এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী। সেই শিক্ষাপ্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। এই মনুষ্যত্বতত্ত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রতিকার করা যায়।

শিষ্য। সে সকল দোষ কি?

গুরু। প্রথম, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ; কার্য্যকারিণী বা চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ।

এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এ দেশে বাঙ্গালিরা অমানুষ হইতেছে; তর্ককুশল, বাগ্মী বা সুলেখক—ইহাই বাঙ্গালির চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয়, পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, দুর্ব্বলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকলগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যযোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই মঙ্গলকর; সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত স্ফূর্ত্তি মঙ্গলদায়ক নহে। আমাদিগের সাধারণ লোকের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাস এরূপ নহে। হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্য, রূপবান্ চন্দ্রে বা বলবান্ কার্ত্তিকেয়ে নিহিত হয় নাই; বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ব্রহ্মায় অর্পিত হয় নাই; রসজ্ঞ গন্ধর্ব্বরাজ বা বাগ্দেবীতে নহে। কেবল সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন—অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতিবিশিষ্ট ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিষ্ণুতে নিহিত হইয়াছে। অনুশীলন নীতির স্থূল গ্রন্থি এই যে, সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ন করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।

শিষ্য। এই গেল একটি দোষ। আর?

গুরু। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে সকলকে এক এক কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদত্তপ্রাণ, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ—সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন সুতরাং ধর্ম্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ—কিন্তু রাজধর্ম্মে অনভিজ্ঞ—অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞ কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি ধর্ম্মচ্যুত—এই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম।

শিষ্য। আপনার ধর্ম্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে।

গুরু। না ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংকর্ষিত করিতে হইবে।

শিষ্য। তাই হউক—কিন্তু সকলের কি তাহা সাধ্য? সকলের সকল বৃত্তিগুলি তুল্যরূপে তেজস্বিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃত্তিগুলি অধিক তেজস্বিনী, সাহিত্যানুযায়িনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে সে এক জন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, এ স্থলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত?

গুরু। প্রতিভার বিচার কালে যাহা বলিয়াছি তাহা স্মরণ কর। সেই কথা ইহার উত্তর। তার পর তৃতীয় দোষ শুন।

জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে, সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন, বৃত্তির স্ফুরণ নহে। যদি কোন বৈদ্য, রোগীকে উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি বা পরিপাকশক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল, অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি,—তেমনি এই জ্ঞানার্জ্জন-বাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল, মানসিক অজীর্ণ—বৃত্তি সকলের অবনতি। মুখস্থ

কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চট্‌পট করিয়া বলিতে পার। তার পর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, স্বশক্তি অবলম্বিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্ত্তারূপ বৃদ্ধ পিতামহীবর্গের আঁচল ধরিয়া চলিল, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি আপনি আহারার্জ্জনে সক্ষম হইল, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্দ্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়—বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে, তাহারা পালে মিশিয়া সচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।

শিষ্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার এত কোপদৃষ্টি কেন?

গুরু। আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছিলাম না। এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ। আমরা যে মহাপ্রভুদিগের অনুকরণ করিয়া, মনুষ্যজন্ম সার্থক করিব মনে করি, তাঁহাদিগেরও বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক।

শিষ্য। ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ? আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়া এত বড় কথা বলিতে সাহস করেন? আবার জ্ঞান পীড়াদায়ক?

গুরু। একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়াও বলি। আমি গোস্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি এক শত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাঁহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিব, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি বলিতে পারিব না। কথাটার বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই—তিক্ত হইয়া উঠিবে। তবে ইংরেজের অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ পথে বাঙ্গালির বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, হয়ত, আরও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। একটা আপত্তি মিটিল ত?

শিষ্য। জ্ঞান পীড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজীর্ণ হইলে পীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান পীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতকগুলা কথা জানিয়াছি, কিন্তু যাহা যাহা জানিয়াছি সে সকলের কি সম্বন্ধ, সকলগুলির সমবায়ের ফল কি, তাহা কিছুই

জানি না। গৃহে অনেক আলো জ্বলিতেছে কেবল সিঁড়িটুকু অন্ধকার। এই জ্ঞান-পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয় তাহা জানে না। এক জন ইংরেজ স্বদেশ হইতে নূতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়া আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা অস্বাদু বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। মালী উপদেশ দিল, "সাহেব! ছোবড়া খাইতে নাই—আঁটি খাইতে হয়।" তার পর আঁব আসিল। সাহেব মালীর উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া ছোবড়া ফেলিয়া দিয়া আঁটি খাইলেন। দেখিলেন, এবারও বড় রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, "সাহেব, কেবল খোসাখানা ফেলিয়া দিয়া, শাঁসটা ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।" সাহেবের সে কথা স্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল। সাহেব, তাহার খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহারপূর্ব্বক আধা কড়িতে বাগান বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারীর ভোগে হয় না। তিনি ছোবড়ার জায়গায় আঁটি, আঁটির জায়গায় ছোবড়া খাইয়া বসিয়া থাকেন। এরূপ জ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র।

শিষ্য। তবে কি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন?

গুরু। পাগল! অস্ত্রখানা শানাইতে গেলে কি শূন্যের উপর শান দেওয়া যায়? জ্ঞেয় বস্তু ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে? জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞানার্জ্জন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, জ্ঞানার্জ্জন যেরূপ উদ্দেশ্য, বৃত্তির বিকাশও সেইরূপ মুখ্য উদ্দেশ্য। আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জ্জনেই জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জনই বটে। কিন্তু যে অনুশীলনপ্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার ঠুসিয়া দেওয়া হইতে থাকে। পাকশক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—ঠুসে গেলা। যেমন কতকগুলি অবোধ মাতা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক অবনতি সংসাধিত করিয়া থাকে, তেমন এখনকার পিতা ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত করেন।

জ্ঞানার্জ্জন ধর্ম্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক পাপ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষারূপ পাপ সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে।

দশম অধ্যায়।—মনুষ্যে ভক্তি।

শিষ্য। সুখ, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, পরিণতি, সামঞ্জস্য এবং চরিতার্থতা। বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, পরিণতি এবং সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। বৃত্তিগুলি, শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী। ইহার মধ্যে শারীরিকী ও জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলনপ্রথা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্টা কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন কি, সামঞ্জস্য বুঝিবার সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির উদাহরণে বুঝিয়াছি। নিকৃষ্টা কার্য্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে, বোধ করি, আপনার আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই, তাহাও বুঝিয়াছি। কিন্তু অনুশীলনতত্ত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ। অবশিষ্ট যাহা শ্রোতব্য তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। এক্ষণে যাহাকে কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দ্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই তিনটি বৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ভক্তি প্রীতি দয়া।

শিষ্য। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বৃত্তি নহে? প্রীতি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই সে ভক্তি হইল, এবং আর্ত্তে ন্যস্ত হইলেই তাহা দয়া হইল।

গুরু। যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন কোন আপত্তি নাই; কিন্তু অনুশীলন জন্য তিনটিকে পৃথক্ বিবেচনা করাই ভাল। বিশেষ, ঈশ্বরে ন্যস্ত যে প্রীতি সেই ভক্তি, এমন নহে। মনুষ্য—যথা রাজা, গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র। আর ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল প্রীতি জন্মিতে পারে। তাই, বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ অনুরাগ স্বীকার করেন। সে পাঁচটি দেখিবে, এই ভক্তি, প্রীতি, দয়া মাত্র। তবে কোন ভাবটি মিশ্র কোনটি অমিশ্র, যথা—

শান্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভাব) = ভক্তি।
দাস্য (হনুমদাদির যে ভাব) = ভক্তি + দয়া।
সখ্য (শ্রীদামাদির যে ভাব) = প্রীতি।
বাৎসল্য (নন্দ যশোদা) = প্রীতি + দয়া।
মধুর (রাধা) = ভক্তি + প্রীতি + দয়া।

শিষ্য। কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে ভাব বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা কল্পনা করেন, তাহার মধ্যে দয়া কোথায়?

গুরু। স্নেহ আছে স্বীকার কর?

শিষ্য। করি, কিন্তু স্নেহ ত প্রীতি।

গুরু। কেবল প্রীতি নহে। প্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে স্নেহ। সুতরাং মধুর ভাবের ভিতর দয়াও আছে। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, মনুষ্যবৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ভক্তি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা সন্তুষ্ট হইলেন, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা চাহেন যে, তিনটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী হইবে। ইহা এক দিনের কাজ নহে। ক্রমে একটি একটি, দুইটি দুইটি করিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের পর্য্যায়ক্রমে সর্ব্বশেষে সকলগুলিই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখিতে হইবে, তখন "রাধা" (যে আরাধনা করে) হইতে পারা যায়।

কিন্তু ঈশ্বরভক্তির কথা এখন থাক। আগে মনুষ্যে ভক্তির কথা বলা যাউক। যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, (১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না। (২) নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না।

দেখা যাউক, মনুষ্যমধ্যে কে ভক্তির পাত্র। (১) পিতামাতা ভক্তির পাত্র। তাঁহারা যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। গুরু ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যত্বই অসম্ভব, ইহা শারীরিক বৃত্তি আলোচনা কালে বুঝাইয়াছি। এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বতত্ত্বদর্শী, এজন্য হিন্দুধর্ম্মের গুরুভক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি। পুরোহিত, অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সর্ব্বথা আমাদের হিতানুষ্ঠান করেন এবং আমাদের অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মা ও পবিত্রস্বভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র। যিনি কেবল চাল কলার জন্য পুরোহিত, তিনি ভক্তির পাত্র নহেন। স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম্মে ইহাও বলে, যে স্ত্রীরও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, কেন না, হিন্দুধর্ম্ম বলে যে স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্ম্মের অপেক্ষা কোম্‌ৎ ধর্ম্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং শ্রদ্ধার যোগ্য। যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্ম্মে বা

পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে। গৃহধর্ম্মে ইহারা ভক্তির পাত্র ; যাঁহারা ইঁহাদের স্থানীয় তাঁহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। গৃহমধ্যে যাহারা নিম্নস্থ, তাহারা যদি ভক্তির পাত্রগণকে ভক্তি না করে, যদি পিতা মাতাকে পুত্র কন্যা বা বধূ ভক্তি না করে, যদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে, যদি স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা করে, যদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘৃণা করে, তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নতি নাই—সে গৃহ নরক বিশেষ। এ কথা কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির উদ্রেক অনুশীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্ম্মেরও সেই উদ্দেশ্য। বরং অন্যান্য ধর্ম্মের অপেক্ষা এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রাধান্য আছে। হিন্দুধর্ম্ম যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা তদ্বিষয়ে অন্যতর প্রমাণ।

(২) এখন বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্ত্তার ন্যায়, পিতা মাতার ন্যায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান্—নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে। লর্ড রীপণ সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্যান্য সদুপায় দ্বারা রাজভক্তি অনুশীলিত করিবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্ম্মে পুনঃপুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী ধর্ম্মে হউক বা না হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে এখন আর রাজভক্তির সে স্থান নাই। যেখানে আছে—যথা জর্ম্মাণি বা ইতালি, সেখানে রাজ্য উন্নতিশীল।

শিষ্য। সেই ইউরোপীয় রাজভক্তিটা আমার বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। লোকে রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রাজাকে যে ভক্তি করিবে ইহা বুঝিতে পারি, আকবর বা অশোকের উপর ভক্তিও না হয় বুঝিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় চার্লস বা পঞ্চদশ লুইর মত রাজার উপরে যে রাজভক্তি হয়, ইহার পর মনুষ্যের অধঃপতনের আর গুরুতর চিহ্ন কি হইতে পারে?

গুরু। যে মনুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্তু। যে দেশে একজন রাজা নাই—যে রাজ্য সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার কথা মনে করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, রাজভক্তি কোন মনুষ্যবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে।

আমেরিকার কংগ্রেসের বা ব্রিটিশ পার্লিমেণ্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেস ও পার্লিমেণ্ট ভক্তির পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট বা লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু তত্তৎ সময়ের ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের রাজা তত্তৎ প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র।

শিষ্য। তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা ঔরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে?

গুরু। কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসীদিগের কর্ত্তব্য। কেন না, রাজার স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের অমঙ্গল। কিন্তু সে সকল কথা ভক্তিতত্ত্বে উঠিতেছে না, প্রীতিতত্ত্বের অন্তর্গত। আর একটা কথা বলিয়া রাজভক্তি সমাপ্ত করি। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজপুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ধর্ম্মত সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ততক্ষণই তাঁহারা সম্মানের পাত্র। তার পর তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য।

রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে—কেন না, বেশী মাত্রা অসামঞ্জস্যের কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষেরা সমাজের ভৃত্য—এ কথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশীয় লোক এ কথা বিস্মৃত হইয়া, রাজপুরুষের অপরিমিত তোষামোদ করিয়া থাকেন।

(৩) রাজার অপেক্ষাও, যাঁহারা সমাজের শিক্ষক তাঁহারা ভক্তির পাত্র। গৃহস্থ গুরুর কথা, গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই গুরুগণ, কেবল গার্হস্থ্য গুরু নহেন, সামাজিক গুরু। যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্ম্মবেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, পুরাণবেত্তা, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইঁহাদিগের দ্বারা হইয়াছে। ইঁহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে। ইঁহারা রাজাদিগেরও গুরু। রাজগণ ইঁহাদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, তবে সমাজশাসনে সক্ষম হয়েন। এই হিসাবে, ভারতবর্ষ ভারতীয় ঋষিদিগের সৃষ্টি—এই জন্য ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র,

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গৌতম—সমস্ত ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপেও গলিলীও, নিউটন, কান্ত, কোম্ৎ, দান্তে, সেক্ষপিয়র প্রভৃতি সেই স্থানে।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য্য কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যাঁহা দ্বারা আমি যে পরিমাণে উপকৃত, তাঁহার প্রতি সেই পরিমাণে ভক্তিযুক্ত হইব ?

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকৃষ্টের নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতির জন্য। যাহার ভক্তি নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোকশিক্ষকদিগের প্রতি যে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহাই উদাহরণ স্বরূপ লইয়া বুঝিয়া দেখ। তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পড়িতেছ। যদি সে লেখকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র কোনরূপ শাসিত হইবে না। তাহার মর্ম্মার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সহৃদয়তা না থাকিলে, তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। অতএব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল ; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইঁহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তির অনুশীলন পরম ধর্ম্ম।

শিষ্য। কৈ, এ ধর্ম্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দুধর্ম্মে শিখায় না ?

গুরু। এটা অতি মূর্খের মত কথা। বরং হিন্দুধর্ম্মে ইহা যে পরিমাণে শিখায়, এমন আর কোন ধর্ম্মেই শিখায় নাই। হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্যপ্রণেতা, তাঁহারাই কবি। তাই অনন্তজ্ঞানী হিন্দুধর্ম্মের উপদেশকগণ তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

শিষ্য। আধুনিক মত এই যে, ভণ্ড ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের চাল কলার পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই দুর্জ্জয় ব্রহ্মভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে।

গুরু। তুমি যে ফলের নাম করিলে, যাঁহারা তাহা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাটা তাঁহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা

সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বাহাদুরির জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, বাছিয়া বাছিয়া ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ঐশ্বর্য্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটে। একমন, একধ্যান হইয়া লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই, সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে। তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজ-শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সেজন্য ব্রাহ্মণভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও যুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ—সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ—সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত—সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক কোন জাতিই নহে। প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালি আধুনিক জর্ম্মনি বা ইংলণ্ডবাসী—কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্ম্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক ছিল না।

শিষ্য। তা যাক্। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটীও বেচেন, কালী খাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে?

গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির

একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন?

গুরু। কেন করিব না? ঐ মহাত্মা সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্যপাত্র।

শিষ্য। আপনার এরূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম। মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়-সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঋষিবাক্য এইরূপ আছে;—"পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" পুনশ্চ বনপর্ব্বে অজগর পর্ব্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন, "বেদমূলক সত্য দান ক্ষমা অনৃশংস্য অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি শূদ্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—"অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।" এরূপ কথা আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধ-গৌতম-সংহিতায় ২১ অধ্যায়ে,

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্।
উপবাসরতান্ দান্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ ॥
ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বিত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

ক্ষমবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সকলে শূদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বিত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

শিষ্য। যাক্। এক্ষণে বুঝিতেছি মনুষ্যমধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি ভক্তি অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সমাজ-শিক্ষক। আর কেহ?

গুরু। (৪) যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে না আসিলেও ভক্তির পাত্র। ধার্ম্মিক, নীচজাতীয় হইলেও ভক্তির পাত্র।

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, বা অবস্থাবিশেষে ভক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা বা সম্মান বলিলেও চলে। যে কোন কার্য্যনির্ব্বাহার্থে অপর ব্যক্তির আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি তাহার ভক্তির, নিতান্ত পক্ষে, তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরেজিতে ইহার একটি বেশ নাম আছে—Subordination। এই নামে আগে Official Subordination মনে পড়ে। এ দেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই—কিন্তু যাহা আছে, তাহা বড় ভাল জিনিস নহে। ভক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্তি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ভয় একটা সর্ব্বনিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে। ভয়ের মত মানসিক অবনতির গুরুতর কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে, তাঁহাকে সম্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাচ ভয় করিবে না। কিন্তু Official Subordination ভিন্ন অন্য এক জাতীয় আজ্ঞাকারিতা প্রয়োজনীয়। সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা। ধর্ম্ম কর্ম্ম অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ। সে সকল কাজ সচরাচর পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়—এক জনে হয় না। যাহা পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়, তাহাতে ঐক্য চাই। ঐক্য জন্য ইহাই প্রয়োজনীয় যে এক জন নায়ক হইবে, আর অপরকে তাহার এবং পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্যের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে হইবে। এখানেও Subordination প্রয়োজনীয়। কাজেই ইহা একটি গুরুতর ধর্ম্ম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই। যে কাজ দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া করিতে

হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার না করায় সব বৃথা হয়। এমন অনেক সময় হয়, যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। এ স্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ত্তব্য, যে নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা বহন করেন—নহিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহা স্বীকার করেন না। তাই আমাদের সামাজিক উন্নতি এত অল্প।

(৬) আর ইহাও ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত কথা যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, সে বিষয়ে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠকেও কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিবে।

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান্ হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোম্‌ৎ “মানবদেবীর” পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে দেখ। হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এখন শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহারা এই বিকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইয়াছেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে বুঝি সর্ব্বত্র সর্ব্বথাই সমান—কেহ কাহাকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি, যাহা মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইয়াছে। পিতা এখন “my dear father”—অথবা বুড়ো বেটা। মাতা, বাপের পরিবার। বড় ভাই,* জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন,—তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র—কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করিতে পারি না—কেন না, লক্ষ্মীই আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরুষ, অত্যাচারকারী রাক্ষস। সমাজ-শিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল—গালি ও বিদ্রূপের স্থান। ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধার্ম্মিককে “গো বেচারা” বলিয়া দয়া করি—জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা

নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব না; কাজেই ঐক্যের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমাজের ভয়ে জড়সড় থাকি, কিন্তু সমাজকে ভক্তি করি না। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাদিগের চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য। উন্নতির জন্য ভক্তির যে এত প্রয়োজন তাহা আমি কখন মনে করি নাই।

গুরু। তাই আমি ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু মনুষ্যভক্তির কথাই বলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায়।—ঈশ্বরে ভক্তি।

শিষ্য। আজ, ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি।

গুরু। যাহা কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়াছ, আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহাই ঈশ্বরভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশ; কেবল বলিবার এবং বুঝিবার গোল আছে। "ভক্তি" কথাটা হিন্দুধর্ম্মে বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং হিন্দুধর্ম্মে ইহা বড় প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবেত্তারা ইহা নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এবং খৃষ্টাদি আর্য্যেতর ধর্ম্মবেত্তারাও ভক্তিবাদী। সকলের উক্তির সংশ্লেষ এবং অত্যুন্নত ভক্তদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ দ্বারা, আমি ভক্তির যে স্বরূপ স্থির করিয়াছি, তাহা এক কথায় বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর এবং যত্নপূর্ব্বক স্মরণ রাখিও। নহিলে আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে।

শিষ্য। আজ্ঞা করুন।

গুরু। **যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।**

শিষ্য। বুঝিলাম না।

গুরু। অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যই উপভোগ করে, এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি

বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। অথবা—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইয়াছে।

শিষ্য। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপনি এ পর্য্যন্ত ভক্তি অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বলিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন সকল বৃত্তির সমষ্টিকে ভক্তি বলিতেছেন।

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকল বৃত্তিগুলিই এই এক ভক্তিবৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি হইল। এই কথার দ্বারা, বৃত্তিমধ্যে ভক্তির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। ভক্তি ঈশ্বরার্পিতা হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলি উহার অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে, ইহাই আমার কথার স্থূল তাৎপর্য্য। এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল বৃত্তির সমষ্টি ভক্তি।

শিষ্য। কিন্তু তাহা হইলে সামঞ্জস্য কোথা গেল? আপনি বলিয়াছেন যে, সকল বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফূর্ত্তিই মনুষ্যত্ব। সেই সমুচিত স্ফূর্ত্তির এই অর্থ করিয়াছেন যে, কোন বৃত্তির সমধিক স্ফূর্ত্তির দ্বারা অন্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্তিই যদি এই এক ভক্তিবৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই যদি অন্য বৃত্তিগুলিকে শাসিত করিতে লাগিল, তবে পরস্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রহিল?

গুরু। ভক্তির অনুবর্ত্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন করে না। মনুষ্যের বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। যে বৃত্তির যত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানুবর্ত্তী হইলে, সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,—অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি, অনন্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,—তাহার আবার অবরোধ কোথায়? ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য।

শিষ্য। তবে আপনি যে মনুষ্যত্ব-তত্ত্ব এবং অনুশীলনধর্ম্ম আমাকে শিখাইতেছেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য কি এই যে, ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বরে ভক্তি?

গুরু। অনুশীলনধর্ম্মের মর্ম্মে এই কথা আছে বটে যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম। ইহাই স্থায়ী সুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ "ভক্তি, প্রীতি, শান্তি।" ইহাই ধর্ম্ম

—ইহা ভিন্ন ধর্ম্মান্তর নাই। আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিন্তু তুমি এমন মনে করিও না যে, এই কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলন ধর্ম্ম বুঝিলে।

শিষ্য। আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহা আমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি। অনুশীলন ধর্ম্মে এই তত্ত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আপনি বৃত্তি যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক বল, অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা Faculty না হউক, একটা বৃত্তি বটে। অনুশীলন ধর্ম্মের বিধানানুসারে, ইহার সমুচিত অনুশীলন চাই। মনে করুন, রোগ দারিদ্র্য আলস্য বা তাদৃশ অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তির এই বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তি হয় নাই। তাহার কি ঈশ্বরভক্তি ঘটিতে পারে না?

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, যে অবস্থায় মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, তাহাই ভক্তি। ঐ ব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক্, অল্প থাক্, যতটুকু আছে, তাহা যদি ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানুমত কার্য্যে প্রযুক্ত হয়—আর অন্য বৃত্তিগুলিও সেইরূপ হয়, তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। তবে অনুশীলনের অভাবে, ঐ ভক্তির কার্য্যকারিতার, সেই পরিমাণে ত্রুটি ঘটিবে। এক জন দস্যু একজন ভাল মানুষকে পীড়িত করিতেছে। মনে কর, দুই ব্যক্তি তাহা দেখিল। মনে কর, দুই জনেই ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত কিন্তু এক জন বলবান, অপর দুর্ব্বল। যে বলবান, সে ভাল মানুষকে দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত করিল, কিন্তু যে দুর্ব্বল, সে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। এই পরিমাণে, বৃত্তিবিশেষের অনুশীলনের অভাবে, দুর্ব্বল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্পূর্ণতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির ত্রুটি বলা যায় না। বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই; এবং সেই বৃত্তিগুলি ভক্তির অনুগামী না হইলেও মনুষ্যত্ব নাই। উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব। ইহাতে বৃত্তিগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে। তাই বলিতেছিলাম যে, বৃত্তিগুলির ঈশ্বরসমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মনুষ্যত্ব বুঝিলে না। তাহার সঙ্গে এটুকুও বুঝা চাই।

শিষ্য। এখন আরও আপত্তি আছে। যে উপদেশ অনুসারে কার্য্য হইতে পারে না, তাহা উপদেশই নহে। সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ একটা বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায়?

গুরু। জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার কি স্মরণ হয়?

ক্রোধং প্রভো সংহরসংহরেতি,
যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।

তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনঞ্চকার ॥

এই ক্রোধ মহা পবিত্র ক্রোধ—কেন না যোগভঙ্গকারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইল। ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচবৃত্তি যে ব্যাসদেবে ঈশ্বরানুবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্তু তুমি উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না।

শিষ্য। আরও আপত্তি আছে—

গুরু। থাকাই সম্ভব। "যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।" এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতর তত্ত্ব নিহিত আছে যে, ইহা তুমি যে একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র দেখিবে, হয়ত পরিশেষে ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও, সহসা নিরাশ হইও না। দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর, এই তত্ত্বের চিন্তা করিও। কার্য্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির ন্যায়, ইহা ক্রমশ তোমার চক্ষে পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল, বিবেচনা করিবে। মনুষ্যের শিক্ষণীয়, এমন গুরুতর তত্ত্ব আর নাই। এক জন মনুষ্যের সমস্ত জীবন সৎশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে যদি শেষে এই তত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে।

শিষ্য। যাহা এরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহা আপনিই বা কোথায় পাইলেন?

গুরু। অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব?" "লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। "জীবন

লইয়া কি করিব ?" এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই এক মাত্র সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুমি এক দিনে ইহার কি বুঝিবে ?

শিষ্য। আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি যে, ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনার নিজের মত। আর্য্য ঋষিরা এ তত্ত্ব অনবগত ছিলেন।

গুরু। মূর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, যাহা আর্য্য ঋষিগণ জানিতেন না—আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম সে ভাষায়, সে কথায়, তাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝান নাই। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক—উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য। ভক্তি শাণ্ডিল্যের সময়ে যাহা ছিল, তাহাই আছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা আর্য্য ঋষিদিগের উপদেশমধ্যে প্রাপ্তব্য। তবে যেমন সমুদ্রনিহিত রত্নের যথার্থ স্বরূপ, ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাধ সমুদ্র হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরে ডুব না দিলে, তদন্তর্নিহিত রত্ন সকল চিনিতে পারা যায় না।

শিষ্য। আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাঁহাদের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা শুনি।

গুরু। শুনা নিতান্ত আবশ্যক, কেন না, ভক্তি হিন্দুরই জিনিস। খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ আছে বটে, কিন্তু হিন্দুরই নিকট ভক্তির যথার্থ পরিণামপ্রাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা সবিস্তারে বলিবার বা শুনিবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে না। আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুশীলন ধর্ম্ম বুঝা, তাহার জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; স্থূল কথা তোমাকে বলিয়া যাইব।

শিষ্য। আগে বলুন, ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিন্দুধর্ম্মের অংশ ?

গুরু। না, তাহা নহে। বৈদিক ধর্ম্মে ভক্তি নাই। বেদের ধর্ম্মের পরিচয়, বোধ হয়, তুমি কিছু জান। সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্ম্মে উপাস্য উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। 'হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত

এই সোমরস পান কর। হবি ভোজন কর, আর, আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন, 'আমার পাপ ধ্বংস কর।' দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকর্ম্ম বলে। কাম্যাদি কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই কাজ করিলে তাহার এই ফল, অতএব কাজ করিতে হইবে—এইরূপে ধর্ম্মার্জ্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাতুর্ভাব হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম বৃথাধর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন।

এই সকল কারণে কর্ম্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন—সেই বিপ্লবের ফলে আশিয়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। এক দল চার্ব্বাক,—তাঁহারা বলিলেন, কর্ম্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা—খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নেতা শাক্যসিংহ—তিনি বলিলেন, কর্ম্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম্ম হইতে পুনর্জ্জন্ম, অতএব কর্ম্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্তসংযমপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মপথে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে—সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা জানা কঠিন—তাহা জানাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানই ধর্ম্ম—জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্ত্তি। ব্রহ্মনিরূপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক। দর্শনের মধ্যে কেবল পূর্ব্বমীমাংসা কর্ম্মবাদী—আর সকলেই জ্ঞানবাদী।

শিষ্য। জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে পারি বটে, কিন্তু জ্ঞানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই কি পাওয়া যায়? ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে পারিলাম—বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত হইলাম? দুইকে এক করিয়া মিলাইয়া দিবে কে?

গুরু। এই ছিদ্রেই ভক্তিবাদের সৃষ্টি। ভক্তিবাদী বলিলেন, জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কিন্তু জানিতে পারিলেই কি তাঁহাকে পাইলাম? অনেক জিনিস আমরা জানিয়াছি—জানিয়াছি বলিয়া কি তাহা পাইয়াছি? আমরা যাহাকে দ্বেষ করি তাহাকেও ত জানি, কিন্তু তাহার সঙ্গে কি আমরা মিলিত হইয়াছি? আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ করি, তবে কি তাঁহাকে পাইব? বরং যাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা। যে শরীরী, তাহাকে কেবল অনুরাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যিনি অশরীরী, তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাঁহাকে পাইব। সেই প্রকারের অনুরাগের নাম ভক্তি। শাণ্ডিল্য সূত্রের দ্বিতীয় সূত্র এই—"সা (ভক্তিঃ) পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

শিষ্য। ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আমি বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। ইহা না শুনিলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। শুনিয়া আর একটা কথা মনে উদয় হইতেছে। সাহেবেরা এবং দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এদেশীয় পণ্ডিতেরা বৈদিক ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন, এবং পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্দুধর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ কথা অতিশয় অযথার্থ। ভক্তিশূন্য যে ধর্ম্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম—অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্ম্মই নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বা আধুনিক বৈষ্ণবাদি ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাঁহারা এ সকল ধর্ম্মের লোপ করিয়া, বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করি।—

গুরু। কথা যথার্থ। তবে ইহাও বলিতে হয় যে, বেদে যে ভক্তিবাদ কোথাও নাই, ইহাও ঠিক নহে। শাণ্ডিল্য সূত্রের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি শব্দ ব্যবহৃত না থাকিলেও ভক্তিবাদের সারমর্ম্ম তাহাতে আছে। বচনটি এই—"আত্মৈবেদং সর্বমিতি। সবাএষএব পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতীতি।"

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই (অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে)। যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই

যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ (আপনার রাজা বা আপনার দ্বারা রঞ্জিত) হয়। ইহা যথার্থ ভক্তিবাদ।

দ্বাদশ অধ্যায়।—ভক্তি।

ঈশ্বরে ভক্তি।—শাণ্ডিল্য।

গুরু। শ্রীমদ্ভগবদগীতাই ভক্তিতত্ত্বের প্রধান গ্রন্থ। কিন্তু গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইবার আগে ঐতিহাসিক প্রথাক্রমে বেদে যতটুকু ভক্তিতত্ত্ব আছে, তাহা তোমাকে শুনান ভাল। বেদে এ কথা প্রায় নাই, ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা বলিয়াছি। যাহা আছে, তাহার সহিত শাণ্ডিল্য মহর্ষির নাম সংযুক্ত।

শিষ্য। যিনি ভক্তিসূত্রের প্রণেতা ?

গুরু। প্রথমে তোমাকে আমার বলা কর্ত্তব্য যে, দুই জন শাণ্ডিল্য ছিলেন, বোধ হয়। এক জন উপনিষদুক্ত এই ঋষি। আর এক জন শাণ্ডিল্য-সূত্রের প্রণেতা। প্রথমোক্ত শাণ্ডিল্য প্রাচীন ঋষি, দ্বিতীয় শাণ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত। ভক্তিসূত্রের ৩১ সূত্রে প্রাচীন শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিষ্য। অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সূত্রকার প্রাচীন ঋষির নামে আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা করুন।

গুরু। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। বেদান্ত-সূত্রের শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে সূত্রবিশেষের ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে কোলব্রুক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য। তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে ; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা যায় না যে, শাণ্ডিল্যই পঞ্চরাত্রের প্রণেতা। ফলে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য যে ভক্তি ধর্ম্মের এক জন প্রবর্ত্তক, তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। কথিত ভাষ্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভক্তিবাদী শাণ্ডিল্যের [illegible] করিয়া বলিতেছেন।—

"বেদপ্রতিষেধশ্চভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধা শাণ্ডিল্য [illegible] মধিগতবান্। ইত্যাদি বেদনিন্দা দর্শনাৎ। তস্মাদসঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি সিদ্ধং।"

হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর।—

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্ত-হৃদয় এতদ্‌ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভাবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাঽস্তীতিঽস্মাৎ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।"

অর্থাৎ, "সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্য বিহীন, এবং আপ্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই ব্রহ্ম। এই লোক হইতে অবসৃত হইয়া, ইঁহাকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাঁহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন।"

এ কথা বড় অধিক দূর গেল না। এ সকল উপনিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া থাকেন। "শ্রদ্ধা" কথা ভক্তিবাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে, সংশয় থাকে না, এ সকল ভক্তির কথা বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেদান্তসারে পাওয়া যায়। বেদান্তসারকর্ত্তা সদানন্দাচার্য্য উপাসনা শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানস-ব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি।"

এখন একটু অনুধাবন করিয়া বুঝ। হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে—অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা দুই রকমে বুঝিয়া থাকে। ঈশ্বর নির্গুণ এবং ঈশ্বর সগুণ। তোমাদের ইংরেজিতে যাহাকে "Absolute" বা "Unconditioned" বলে, তাহাই নির্গুণ। যিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন উপাসনা হইতে পারে না; যিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন গুণানুবাদ করা যাইতে পারে না; যিনি নির্গুণ, যাঁহার কোন "Conditions of Existence" নাই বা বলা যাইতে পারে না—তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব? কি বলিয়া তাঁহার চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা হইতে পারে। নির্গুণবাদে উপাসনা নাই। সগুণ বা ভক্তিবাদী অর্থাৎ শাণ্ডিল্যাদিই উপাসনা করিতে পারেন। অতএব বেদান্তসারের এই কথা হইতে দুইটি বিষয় সিদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম

সগুণবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য। ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য। আর ভক্তি সগুণবাদেরই অনুসারিণী।

শিষ্য। তবে কি উপনিষদ্ সমুদয় নির্গুণবাদী?

গুরু। ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নির্গুণবাদী আছে কি না, সন্দেহ। যে প্রকৃত নির্গুণবাদী, তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হয়। তবে, জ্ঞানবাদীরা মায়া নামে ঈশ্বরের একটি শক্তি কল্পনা করেন। সেই মায়াই এই জগৎসৃষ্টির কারণ। সেই মায়ার জন্যই আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং ব্রহ্মে লীন হইতে পারা যায়। অতএব ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে কেবল জ্ঞেয়। এই জ্ঞান ঠিক "জানা" নহে। সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধনা। ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে অন্য বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দম। তদতিরিক্ত বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, অথবা বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগই উপরতি। শীতোষ্ণাদি সহন, তিতিক্ষা। মনের একাগ্রতা, সমাধান। গুরু বাক্যাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। সর্ব্বত্র এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে। কিন্তু ধ্যান ধারণা তপস্যাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত। অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাসনা আছে। উহা অনুশীলন বটে। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, উপাসনাও অনুশীলন। অতএব জ্ঞানবাদীর ঈদৃশ অনুশীলনকে তুমি উপাসনা বলিতে পার। কিন্তু সে উপাসনা যে অসম্পূর্ণ, তাহাও পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে। যথার্থ উপাসনা ভক্তি-প্রসূত। ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইতে হইবে। সেই সময়ে একথা আর একটু স্পষ্ট হইবে।

শিষ্য। এক্ষণে আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে যে সেই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্যই ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্ত্তক?

গুরু। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শাণ্ডিল্যের নাম আছে, তেমনি দেবকীনন্দন কৃষ্ণেরও নাম আছে। অতএব কৃষ্ণ আগে কি শাণ্ডিল্য আগে তাহা আমি জানি না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি শাণ্ডিল্য ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্ত্তক তাহা বলিতে পারি না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।—ভক্তি।

ভগবদ্গীতা। স্থূল উদ্দেশ্য।

শিষ্য। এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্বের কথা শুনিবার বাসনা করি।

গুরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। কিন্তু প্রকৃত ভক্তির ব্যাখ্যা দ্বাদশ অধ্যায়ে অতি অল্পই আছে। দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত সকল অধ্যায়গুলির পর্য্যালোচনা না করিলে, গীতোক্ত প্রকৃত ভক্তিতত্ত্ব বুঝা যায় না। যদি গীতার ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে চাও, তাহা হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে। এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তি, তিনেরই কথা আছে—তিনেরই প্রশংসা আছে। যাহা আর কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা যাহা, তাহা ভক্তি। এই জন্য গীতা প্রকৃত পক্ষে ভক্তিশাস্ত্র।

শিষ্য। কথাগুলি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় অন্তরঙ্গ বধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন—ইহাই গীতার বিষয়। অতএব ইহাকে ঘাতক-শাস্ত্র বলাই বিধেয়; উহাকে ভক্তিশাস্ত্র বলিব কি জন্য?

গুরু। অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাঁহারা গ্রন্থের একখানা পাতা পড়িয়া মনে করেন, আমরা এ গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি। যাঁহারা এই শ্রেণীর পণ্ডিত, তাঁহারাই ভগবদ্গীতাকে ঘাতক-শাস্ত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। স্থূল কথা এই যে, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। যুদ্ধ মাত্র যে পাপ নহে এ কথা তোমাকে পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি।

শিষ্য। বুঝাইয়াছেন যে আত্মরক্ষার্থ এবং স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্মমধ্যে গণ্য।

গুরু। এখানে অর্জ্জুন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত। কেন না আপনার সম্পত্তি উদ্ধার—আত্মরক্ষার অন্তর্গত।

শিষ্য। যে নরপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই এই কথা বলিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত হয়। নরপিশাচপ্রধান প্রথম নেপোলেয়ন্ ফ্রান্স রক্ষার ওজর করিয়া ইউরোপ নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছিল।

গুরু। তাহার ইতিহাস যখন নিরপেক্ষ লেখকের দ্বারা লিখিত হইবে, তখন জানিতে পারিবে, নেপোলেয়নের কথা মিথ্যা নহে। নেপোলেয়ন্ নরপিশাচ ছিলেন না। যাক্—সে কথা বিচার্য্য নহে। আমাদের বিচার্য্য এই যে, অনেক সময়, যুদ্ধও পুণ্য কর্ম্ম।

শিষ্য। কিন্তু সে কখন্?

গুরু। এ কথার দুই উত্তর আছে। এক, ইউরোপীয় হিতবাদীর উত্তর। সে উত্তর এই যে, যুদ্ধে যেখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট করিয়া কোটি কোটি লোকের হিত সাধন করা যায়, সেখানে যুদ্ধ পুণ্য কর্ম্ম। কিন্তু কোটি লোকের জন্য এক লক্ষ লোককেই বা সংহার করিবার আমাদের কি অধিকার? এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর ভারতবর্ষীয়। এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিক। হিন্দুর সকল নীতির মূল আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক। সেই মূল, যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার ন্যায় এমন একটা কঠিন তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যেমন বিশদ রূপে বুঝান যায়, সামান্য তত্ত্বের উপলক্ষে সেরূপ বুঝান যায় না। তাই গীতাকার অর্জ্জুনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কল্পিত করিয়া, তদুপলক্ষে পরম পবিত্র ধর্ম্মের আমূল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শিষ্য। কথাটা কিরূপে উঠিতেছে?

গুরু। ভগবান্ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝাইতেছেন। প্রথমে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা প্রভৃতি, যাহা জ্ঞানের বিষয়। ইহা জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন,—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩। ৩

ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া কর্ম্মযোগ সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। এই জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে পারিবে যে, গীতা ভক্তিশাস্ত্র—তাই এত সবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার পরিচয় দিতেছি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।—ভক্তি।

ভগবদ্গীতা—কর্ম্ম।

গুরু। এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কর্ম্মযোগ বুঝাইতেছি, কিন্তু তাহা শুনিবার আগে, ভক্তির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা মনে কর। মনুষ্যের যে অবস্থায় সকল

বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরাভিমুখী হয়, মানসিক সেই অবস্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা ঘটে, তাহাই ভক্তি। এক্ষণে শ্রবণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিয়া অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৩।৫

কেহই কখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে প্রকৃতিজাত গুণ সকলের দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব কর্ম্ম করিতেই হইবে। কিন্তু সে কি কর্ম্ম?

কর্ম্ম বলিলে বেদোক্ত কর্ম্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার প্রসাদার্থ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বুঝাইত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম বুঝাইত। এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীতোক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষের পরিচয়ের আরম্ভ। সেই বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন,

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফল প্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২। ৪২-৪৪

"যাহারা বক্ষ্যমানরূপ শ্রুতিসুখকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশূন্য। যাহারা বেদবাক্যে রত হইয়া, ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা কামপরবশ হইয়া স্বর্গই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া জন্মই কর্ম্মের ফল ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা (কেবল) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্যমাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা অতি মূর্খ। এইরূপ বাক্যে অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে না।"

অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্ম বা কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নহে। অথচ কর্ম্ম করিতেই হইবে। তবে কি কর্ম্ম করিতে হইবে? যাহা কাম্য নহে তাহাই নিষ্কাম। যাহা নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, তাহা কর্ম্ম মার্গ মাত্র, কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

শিষ্য। নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলি।

গুরু। নিষ্কাম কর্ম্মের এই লক্ষণ ভগবান্ নির্দ্দেশ করিতেছেন,

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ২। ৪৭

অর্থাৎ, তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কদাচ কর্ম্মফলে যেন না হয়। কর্ম্মের ফলার্থী হইও না ; কর্ম্মত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক।

অর্থাৎ, কর্ম্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

শিষ্য। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্ম্ম করিব কেন? যদি পেট ভরিবার আকাঙ্ক্ষা না রাখি, তবে ভাত খাইব কেন?

গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া ভগবান্ পর-শ্লোকে ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়!"

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। প্রথম—সঙ্গ কি?

গুরু। আসক্তি। যে কর্ম্ম করিতেছ, তাহার প্রতি কোন প্রকার অনুরাগ না থাকে। ভাত খাওয়ার কথা বলিতেছিলে। ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই; কেন না "প্রকৃতিজ গুণে" তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্তু আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে অনুরাগযুক্ত হইয়া ভোজন করিও না।

শিষ্য। আর "যোগস্থ" কি?

গুরু। পর-চরণে তাহা কথিত হইতেছে।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥

কর্ম্ম করিবে, কিন্তু কর্ম্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে। তোমার যত দূর কর্ত্তব্য তাহা তুমি করিবে। তাতে তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে সিদ্ধ্যসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান্ যোগ বলিতেছেন। এইরূপ যোগস্থ হইয়া, কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান।

শিষ্য। এখনও বুঝিলাম না। আমি সিঁধ কাটি লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে যাইতেছি। কিন্তু আপনি সজাগ আছেন, এজন্য চুরি করিতে পারিলাম না। তার জন্য দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, "আচ্ছা হলো হলো, না হলো না হলো।" আমি কি নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম?

গুরু। কথাটা ঠিক সোণার পাথরবাটির মত হইল। তুমি মুখে, হলো হলো, না হলো না হলো বল, আর নাই বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রায় কর, তাহা হইলে তুমি কখনই মনে এরূপ ভাবিতে পারিবে না। কেন না চুরির ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, তুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে "কর্ম্ম" বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। "কর্ম্ম" কি, তাহা পরে বুঝাইতেছি। কিন্তু চুরি "কর্ম্ম" মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া কর নাই। এজন্য ঈদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানকে সৎ ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না।

শিষ্য। ইহাতে যে আপত্তি, তাহা পূর্ব্বেই করিয়াছি। মনে করুন, আমি বিড়ালের মত ভাত খাইতে বসি, বা উইলিয়ম দি সাইলেণ্টের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, দুইয়েতেই আমাকে ফলার্থী হইতে হইবে। অর্থাৎ উদরপূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাতের পাতে বসিতে হইবে, এবং দেশের দুঃখনিবারণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গুরু। ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি, যদি উদরপূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাত খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম্ম নিষ্কাম হইল না। তুমি যদি দেশের দুঃখ নিজের দুঃখ তুল্য বা তদধিক ভাবিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহা হইলেও কর্ম্ম নিষ্কাম হইল না।

শিষ্য। যদি সে আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে কেনই এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব?

গুরু। কেবল ইহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া। আহার এবং দেশোদ্ধার উভয়ই তোমার অনুষ্ঠেয়। চৌর্য্য তোমার অনুষ্ঠেয় নহে।

শিষ্য। তবে কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা কি প্রকারে জানিব? তাহা না বলিলে ত নিষ্কাম ধর্ম্মের গোড়াই বোঝা গেল না?

গুরু। এ অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই। কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় তাহা বলিতেছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩। ৯

এখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর। আমার কথায় তোমার ইহা বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের কথার উপর নির্ভর কর। তিনি এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরস্তদর্থং।"

তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, যে ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম্ম তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধনমাত্র (অনুষ্ঠেয় নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্মই করিবে। ইহার ফল দাঁড়ায় কি? দাঁড়ায়, যে সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্ম্মই নামান্তরে ভক্তি। এইরূপে কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য। কর্ম্মের সহিত ভক্তির ঐক্য স্থানান্তরে আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যথা—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশী নির্ম্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।

অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কর্ম্ম সকল আমাতে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও বিকারশূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

শিষ্য। ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে?

গুরু। "অধ্যাত্মচেতসা" এই বাক্যের সঙ্গে "সংন্যস্য" শব্দ বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "অধ্যাত্মচেতসা" শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "অহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা।" "কর্ত্তা যিনি ঈশ্বর, তাঁহারই জন্য, তাঁহার ভৃত্যস্বরূপ এই কাজ করিতেছি।" এইরূপ বিবেচনায় কাজ করিলে, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ হইল।

এখন এই কর্ম্মযোগ বুঝিলে? প্রথমতঃ কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই কর্ম্ম। যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিবে। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে অর্থাৎ কর্ম্ম তাঁহার, আমি তাঁহার ভৃত্য স্বরূপ কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবে তাহা হইলেই কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হইল।

ইহা করিতে গেলে কার্য্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে। অতএব কর্ম্মযোগই ভক্তিযোগ। ভক্তির সঙ্গে ইহার ঐক্য ও সামঞ্জস্য দেখিলে। এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব, অপূর্ব্ব ধর্ম্ম, কেবল গীতাতেই আছে। এরূপ আশ্চর্য্য ধর্ম্মব্যাখ্যা আর কখন কোন দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। কর্ম্মযোগেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল না, কর্ম্ম ধর্ম্মের প্রথম সোপান মাত্র। কাল তোমাকে জ্ঞানযোগের কথা কিছু বলিব।

পঞ্চদশ অধ্যায়।—ভক্তি।

ভগবদ্গীতা—জ্ঞান।

গুরু। এক্ষণে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবদুক্তির সার মর্ম্ম শ্রবণ কর। কর্ম্মের কথা বলিয়া, চতুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার-কথন সময়ে বলিতেছেন,—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ৪। ১০।

ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকে বিগতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময় (ঈশ্বরময়) এবং আমার উপাশ্রিত হইয়া জ্ঞান তপের দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিষ্য। এই জ্ঞান কি প্রকার?

গুরু। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমুদায় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়। যথা—

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথোময়ি। ৪। ৩৫।

শিষ্য। সে জ্ঞান কিরূপে লাভ করিব?

গুরু। ভগবান্ তাহার উপায় এই বলিয়াছেন,

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪। ৩৪।

অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীদিগের নিকট তাহা অবগত হইবে।

শিষ্য। আপনাকে আমি সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্নের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন।

গুরু। তাহা আমি পারি না, কেন না আমি জ্ঞানীও নহি, তত্ত্বদর্শীও নহি। তবে একটা মোটা সঙ্কেত বলিয়া দিতে পারি।

জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে?

শিষ্য। ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর।

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে কোম্‌তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্ব্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্ব্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দুই—Biology, Sociology, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্ঞা করিবে।

শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানিবে কিসে?

গুরু। হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।

শিষ্য। তবে, জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলই জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

গুরু। যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে করিলেই ঠিক বুঝিবে। জ্ঞানার্জ্জনী-বৃত্তি সকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চ্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি সকলের উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইলে, সেই সঙ্গে অনুশীলন ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে যদি ভক্তি বৃত্তিরও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, তখনই এই গীতোক্ত জ্ঞানে পৌঁছিবে। অনুশীলন ধর্ম্মেই যেমন কর্ম্মযোগ, অনুশীলন ধর্ম্মেই তেমনি জ্ঞানযোগ।

শিষ্য। আমি গণ্ডমূর্খের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলন ধর্ম্ম সকলই উল্টা বুঝিয়াছিলাম; এখন কিছু কিছু বুঝিতেছি।

গুরু। এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্টা কর।

শিষ্য। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্ম্মের পূর্ণতা হইতে পারে? তাহা হইলে পণ্ডিতই ধার্ম্মিক।

গুরু। একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত না

হইলেও সে জ্ঞানী। শ্রীকৃষ্ণ এমত বলিতেছেন না যে, কেবল জ্ঞানেই তাঁহাকে কেহ পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন,

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ৪। ১০

অর্থাৎ যাহারা চিত্তসংযত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারাই জ্ঞানের দ্বারা পূত হইয়া তাঁহাকে পায়। আসল কথা, কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের এমন মর্ম্ম নহে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সংযোগ চাই।* কেবল কর্ম্মে হইবে না, কেবল জ্ঞানেও নহে। কর্ম্মেই আবার জ্ঞানের সাধন। কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্ বলিতেছেন,—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। ৬। ৩।

যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু, কর্ম্মই তাঁহার তদারোহণের কারণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এখানে ভগবদ্বাক্যের অর্থ এই যে কর্ম্মযোগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগ পৌঁছান যায় না।

শিষ্য। তবে কি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে?

গুরু। উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪। ৪১।

হে ধনঞ্জয়! কর্ম্মযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংন্যস্তকর্ম্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবান্‌কে কর্ম্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না।

তবেই চাই (১) কর্ম্মের সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এইরূপে কর্ম্মবাদের ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্ম্ম-প্রণেতৃশ্রেষ্ঠ, ভূতলে মহামহিমাময় এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত করিলেন। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর; কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া পরমার্থ তত্ত্বে সংশয় ছেদন কর। এই জ্ঞানও ভক্তিতে যুক্ত; কেন না,—

---

* বলা বাহুল্য যে এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্যের মতের বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে জ্ঞান কর্ম্মে সমুচ্চয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের মতের যাহা বিরোধী শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কথায় এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না, তাহা আমি জানি। পক্ষান্তরে ইহাও কর্ত্তব্য যে শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি ভক্তিবাদীগণ শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী নন। এবং অনেক পূর্ব্বগামী পণ্ডিত শঙ্করের মতের বিরোধী বলিয়াই তাঁহাকে স্বপক্ষসমর্থন জন্য ভাষ্যের মধ্যে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥ ৫। ১৭।

ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাঁহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহারা তৎপরায়ণ, তাহাদের পাপ সকল জ্ঞানে নির্দ্ধূত হইয়া যায়, তাহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। এখন বুঝিতেছি যে, এই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমবায়ে ভক্তি। কর্ম্মের জন্য প্রয়োজন—কার্য্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। জ্ঞানের জন্য চাই—জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তিগুলি ঐরূপ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। আর চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি?

গুরু। সেইরূপ হইবে। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকল বুঝাইবার সময়ে বলিব।

শিষ্য। তবে মনুষ্যে সমুদয় বৃত্তি উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলে, এই গীতোক্ত জ্ঞানকর্ম্মন্যাস যোগে পরিণত হয়। এতদুভয়ই ভক্তিবাদ। মনুষ্যত্ব ও অনুশীলন ধর্ম্ম যাহা আমাকে শুনাইয়াছেন, তাহা এই গীতোক্ত ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র।

গুরু। ক্রমে এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে।

ষোড়শ অধ্যায়।—ভক্তি।

ভগবদ্গীতা—সন্ন্যাস।

গুরু। তার পর, আর একটা কথা শোন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যৌবনে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়, মধ্য বয়সে গৃহস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্ম্মে ঠিক তাহা বলা হয় নাই; বরং কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে এমন কথা বলা হইয়াছে। ইহাই সত্য কথা, কেন না অধ্যয়নও কর্ম্মের মধ্যে, এবং কেবল অধ্যয়নে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সে যাই হৌক, মনুষ্যের এমন এক দিন উপস্থিত হয় যে, কর্ম্ম করিবার সময়ও নহে, জ্ঞানোপার্জ্জনের সময়ও নহে। তখন জ্ঞান উপার্জ্জিত হইয়াছে, কর্ম্মেরও শক্তি বা প্রয়োজন আর নাই। হিন্দুশাস্ত্রে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবার বিধি আছে। তাহাকে সচরাচর সন্ন্যাস বলে। সন্ন্যাসের স্থূল মর্ম্ম কর্ম্মত্যাগ। ইহাও মুক্তির উপায় বলিয়া ভগবৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। বরং তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, যদিও জ্ঞানযোগে আরোহণ করিবার যে ইচ্ছা করে, কর্ম্মই তাহার সহায়, কিন্তু যে জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছে, কর্ম্মত্যাগ তাহার সহায়।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৬। ৩

শিষ্য। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা। তবে কি সংসারত্যাগ একটা ধর্ম্ম? জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক কি তাই বিহিত?

গুরু। পূর্ব্বগামী হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের তাহাই মত বটে। জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগ যে তাহার সাধনের সাহায্য করে, তাহাও সত্য। এ বিষয়ে ভগবদ্বাক্যই প্রমাণ। তথাপি কৃষ্ণোক্ত এই পুণ্যময় ধর্ম্মের এমন শিক্ষা নহে যে, কেহ কর্ম্মত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ করিবে। ভগবান্ বলেন যে, কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ৫। ২

শিষ্য। তাহা কখনই হইতে পারে না। জ্বরত্যাগটা যদি ভাল হয়, তবে জ্বর কখন ভাল নহে। কর্ম্মত্যাগ যদি ভাল হয়, তবে কর্ম্ম ভাল হইতে পারে না। জ্বরত্যাগের চেয়ে কি জ্বর ভাল?

গুরু। কিন্তু এমন যদি হয় যে, কর্ম্ম রাখিয়াও কর্ম্মত্যাগের ফল পাওয়া যায়?

শিষ্য। তাহা হইলে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কেন না, তাহা হইলে কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ উভয়েরই ফল পাওয়া গেল।

গুরু। ঠিক তাই। পূর্ব্বগামী হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ—কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ। গীতার উপদেশ—কর্ম্ম এমন চিত্তে কর যে, তাহাতেই সন্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস—সন্ন্যাসে আবার বেশী কি আছে? বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিষ্প্রয়োজনীয় দুঃখ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৫। ৩-৬।

"যাঁহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহাকেই নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিও। হে মহাবাহো! তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষেরাই সুখে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। (সাংখ্য।) সন্ন্যাস ও (কর্ম্ম) যোগ যে পৃথক্ ইহা বালকেই বলে, পণ্ডিতে নহে। একের আশ্রয়ে, একত্রে উভয়েরই ফললাভ করা যায়। সাংখ্যে (সন্ন্যাস) * যাহা পাওয়া যায়, (কর্ম্ম) যোগেও তাই পাওয়া যায়। যিনি উভয়কে একই দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ বিনা সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। যোগমুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্ম পায়েন। স্থূল কথা এই যে, যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকলই করিয়া থাকেন, অথচ চিত্তে সকল কর্ম্মসম্বন্ধেই সন্ন্যাসী, তিনিই ধার্ম্মিক।

শিষ্য। এই পরম বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এখন বৈরাগীরা ডোর কৌপীন পরিয়া সং সাজিয়া বেড়ায় কেন বুঝিতে পারি না। ইংরেজেরা যাহাকে Asceticism বলেন, বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না, এখন দেখিতেছি। এই পরম পবিত্র ধর্ম্মে সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। অথচ এমন পবিত্র, সর্ব্বব্যাপী, উন্নতিশীল বৈরাগ্য আর কোথাও নাই। ইহাতে সর্ব্বত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকর্ম্ম বৈরাগ্য; অথচ Asceticism কোথাও নাই। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য্য ধর্ম্ম, এমন সত্যময় উন্নতিকর ধর্ম্ম, জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। গীতা থাকিতে, লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা কোরাণে ধর্ম্ম খুঁজিতে যায়, ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই ধর্ম্মের প্রথম প্রচারকের কাছে কেহই ধর্ম্মবেত্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। এ অতিমানুষ ধর্ম্মপ্রণেতা কে?

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত এ কথাও বলা যাইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ যে গীতোক্ত ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। ফলে তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, এক নিষ্কামবাদের দ্বারা সমুদায় মনুষ্যজীবন শাসিত, এবং নীতি ও ধর্ম্মের সকল উচ্চতত্ত্ব একতা প্রাপ্ত হইয়া, পবিত্র হইতেছে। কাম্য কর্ম্মের ত্যাগই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ১৮। ২

---

* "সাংখ্য" কথাটির অর্থ লইয়া আপাততঃ গোলযোগ বোধ হইতে পারে। যাঁহাদিগের এমত সন্দেহ হইবে, তাঁহারা শাঙ্কর ভাষ্য দেখিবেন।

যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।

শিষ্য। মানুষের অদৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে?

গুরু। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। দুই-ই তোমাদের হাতে। এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্ত্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছি। যে যাহা হউক, এক্ষণে এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মহীন সন্ন্যাস, নিকৃষ্ট সন্ন্যাস। কর্ম্ম, বুঝাইয়াছি—ভক্ত্যাত্মক। অতএব এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্ত্যাত্মক কর্ম্মযুক্ত সন্ন্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস।

সপ্তদশ অধ্যায়।—ভক্তি।

ধ্যান বিজ্ঞানাদি।

গুরু। ভগবদ্গীতা পাঁচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে সৈন্যদর্শন, দ্বিতীয়ে জ্ঞানযোগের স্থূলাভাস, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কর্ম্মযোগ, চতুর্থে জ্ঞান-কর্ম্ম-ন্যাসযোগ, পঞ্চমে সন্ন্যাসযোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি। ষষ্ঠে ধ্যানযোগ। ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান, সুতরাং উহার পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন নাই। যে ধ্যানমার্গাবলম্বী, সে যোগী। যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়; যে অবস্থায় বিশুদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়; যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্রলোভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধ হয়; যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না; যে অবস্থা লাভ করিলে, অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ—নহিলে খাওয়া ছাড়িয়া বার বৎসর একঠাঁই বসিয়া চোক্ বুজিয়া ভাবিলে যোগ হয় না। কিন্তু যোগীর মধ্যেও প্রধান ভক্ত—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬। ৪৭।

"যে আমাতে আসক্তমনা হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, আমার মতে যোগযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ।" ইহাই ভগবদ্ভক্তি। অতএব এই গীতোক্ত ধর্ম্মে, জ্ঞান কর্ম্ম ধ্যান সন্ন্যাস—ভক্তি ব্যতীত কিছুই সম্পূর্ণ নহে। ভক্তিই সর্ব্বসাধনের সার।

সপ্তমে বিজ্ঞানযোগ। ইহাতেই ঈশ্বর, আপন স্বরূপ কহিতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে নির্গুণ ও সগুণ, অর্থাৎ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বর্ণিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বিশদরূপে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। অতএব ভক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়।

অষ্টমে তারকব্রহ্মযোগ। ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিযোগ। ইহার স্থূল তাৎপর্য্যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নবমাধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগুহ্যযোগ। ইহাতে অতিশয় মনোহারিণী কথা সকল আছে। ইতিপূর্ব্বে জগদীশ্বর একটি অতিশয় মনোহর উপমার দ্বারা আপনার সহিত জগতের সম্বন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন,—"যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।" অষ্টমে আর একটি সুন্দর উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—

"আমার আত্মা ভূত সকল ধারণ ও পালন করিতেছে, কিন্তু কোন ভূতেই অবস্থান করিতেছে না। যেমন সমীরণ সর্ব্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও, প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে।" হর্বর্ট স্পেন্সরের নদীর উপর জলবুদ্বুদের উপমা অপেক্ষা এই উপমা কত গুণে শ্রেষ্ঠ।

শিষ্য। চক্ষু হইতে আমার ঠুলি খসিয়া পড়িল।* আমার একটা বিশ্বাস ছিল—যে নির্গুণ ব্রহ্মবাদটা Pantheism মাত্র। এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

গুরু। ইংরেজি সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া এ সকলের আলোচনার দোষ ঐ। আমাদের মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাঁচের টম্‌লরে না খাইলে তাঁহাদের জল মিষ্ট লাগে না। তোমাদের আর একটা ভ্রম আছে বোধ হয় যে, মনুষ্য মাত্রেই—মূর্খ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,—সকল জাতি, সকলেই যে তুল্যরূপে পরিত্রাণের অধিকারী, এ সাম্যবাদ শাক্যসিংহের ধর্ম্মে ও খৃষ্টধর্ম্মেই আছে, বর্ণভেদজ্ঞ হিন্দুধর্ম্মে নাই। এই অধ্যায়ের দুইটা শ্লোক শ্রবণ কর।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্। ৯। ২৯।

* * *

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৯। ৩২

"আমি সকল ভূতের পক্ষে সমান; কেহ আমার দ্বেষ্য বা কেহ প্রিয় নাই; যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, আমি তাহাতে, সে আমাতে। * * পাপযোনিও আশ্রয় করিলে পরাগতি পায়—বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক, সকলেই পায়।"

শিষ্য। এটা বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে।

গুরু। কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে এই একটা পাগলামি প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজ পণ্ডিতগণের কাছে তোমরা শুনিয়াছ যে ৫৪৩ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে (বা ৪৭৭) শাক্যসিংহ মরিয়াছেন; কাজেই তাঁহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত করিতে শিখিয়াছ যে, যাহা কিছু ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে হিন্দুধর্ম্ম এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী যে, ভাল জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। এই অনুকরণপ্রিয় সম্প্রদায় ভুলিয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম নিজেই এই হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল, ত আর কোন ভাল জিনিষ কি তাহা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না?

শিষ্য। যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে আপনার এ রাগটুকু সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে রাজগুহ্যযোগের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই।

গুরু। রাজগুহ্যযোগ সর্ব্বপ্রধান সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই, যদিও ঈশ্বর সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যে-ভাবে চিন্তা করে, সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পায়। যাঁহারা দেবদেবীর সকাম উপাসনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহে সিদ্ধকাম হইয়া স্বর্গ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা নিষ্কাম বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন, কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। তবে যাঁহারা সকাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহারা যে ভাবান্তরে ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বর পান না, তাহার কারণ সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পরন্তু ঈশ্বরের নিষ্কাম উপাসনাই মুখ্য উপাসনা, তদ্ভিন্ন ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অতএব সর্ব্বকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক

সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করাই ধর্ম্ম ও মোক্ষের উপায়। এই রাজগুহ্য-যোগ ভক্তিপূর্ণ।

সপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে তাঁহার বিভূতি সকল কথিত হইতেছে। এই বিভূতিযোগ অতি বিচিত্র, কিন্তু এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। দশমে বিভূতি সকল বিবৃত করিয়া, তাহার প্রত্যক্ষস্বরূপ, একাদশে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। কালি তোমাকে সেই ভক্তিযোগ শুনাইব।

অষ্টাদশ অধ্যায়।—ভক্তি।

ভগবদ্গীতা—ভক্তিযোগ।

শিষ্য। ভক্তিযোগ বলিবার আগে, একটা কথা বুঝাইয়া দিন। ঈশ্বর এক, কিন্তু সাধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন? সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না।

গুরু। সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে, সকল সময়ে, সোজা পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, তুই এক জন বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে। সাধারণের জন্য ঘুরাণ ফিরাণ পথই বিহিত। এই সংসারে নানাবিধ লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কেহ সংসারী, কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে। যে সংসারী, তাহার পক্ষে কর্ম্ম; যে অসংসারী, তাহার পক্ষে সন্ন্যাস। যে জ্ঞানী, অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগই প্রশস্ত; যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ যে যোগী, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠ রাজগুহ্যযোগই প্রশস্ত। অতএব সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি করুণাময়—যাহাতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম্ম সোজা হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

শিষ্য। কিন্তু আপনি যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল সাধনের অন্তর্গত। তবে এক ভক্তিকে বিহিত বলিলেই, সকলের পক্ষে পথ সোজা হইত।

গুরু। কিন্তু ভক্তির অনুশীলন চাই। তাই বিবিধ সাধন, বিবিধ অনুশীলনপদ্ধতি। আমার কথিত অনুশীলনতত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে এ কথা শীঘ্র বুঝিবে। ভিন্ন ভিন্ন

প্রকৃতির মনুষ্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলনপদ্ধতি বিধেয়। যোগ, সেই অনুশীলনপদ্ধতির নামান্তর মাত্র।

শিষ্য। কিন্তু যে প্রকারে এই সকল যোগ কথিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, সাধন বিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনেকের পক্ষে দুই-ই সাধ্য। যাহার পক্ষে দুই-ই সাধ্য সে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? দুই-ই ভক্তি বটে জানি, তথাপি জ্ঞান-বুদ্ধি-ময়ী ভক্তি, আর কর্ম্ম-ময়ী ভক্তি মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

গুরু। দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে এই প্রশ্নই অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং এই প্রশ্নের উত্তরই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ। এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্যই গীতার পূর্ব্বগামী একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর বুঝা যায় না।

শিষ্য। কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন?

গুরু। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, ও ঈশ্বরভক্ত উভয়েই ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ব্রহ্মোপাসকেরা অধিকতর দুঃখ ভোগ করে; ভক্তেরা সহজে উদ্ধৃত হয়।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ১২। ৫-৭।

শিষ্য। এক্ষণে বলুন তবে এই ভক্ত কে?

গুরু। ভগবান স্বয়ং তাহা বলিতেছেন।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ১২। ১৩—২০

যে মমতাশূন্য, (অর্থাৎ যার 'আমার! আমার!' জ্ঞান নাই) অহঙ্কারশূন্য, যাহার সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতাত্মা এবং দৃঢ়সঙ্কল্প, যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, এমন যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি লোক হইতে নিজে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যে হর্ষ অমর্ষ ভয় এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সেই আমার প্রিয়। যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ, অথচ সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, এমন যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। যাঁহার কিছুতে হর্ষ নাই, অথচ দ্বেষও নাই, যিনি শোকও করেন না, বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, এমন যে ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। যাঁহার নিকট শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতোষ্ণ সুখ ও দুঃখ সমান, যিনি আসঙ্গ-বিবর্জ্জিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতি তুল্য বোধ করেন, যিনি সংযতবাক্য, যিনি যে কিছু দ্বারা সন্তুষ্ট, এবং যিনি সর্ব্বদা আশ্রয়ে থাকেন না, এবং স্থিরমতি, সেই ভক্ত আমার প্রিয়। এই ধর্ম্মামৃত যেমন বলিয়াছি যে সেইরূপ অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রদ্ধাবান্ আমার পরমভক্ত, আমার অতিশয় প্রিয়।"

এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়া পূজার ভান করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না। মালা ঠক্ ঠক্ করিয়া, হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি

ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই। এরূপ উদার, এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই। এই জন্য ভগবদ্গীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

উনবিংশতিতম অধ্যায়।—ভক্তি।

ঈশ্বরে ভক্তি।—বিষ্ণুপুরাণ।

গুরু। ভগবদ্গীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা স্পষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদ-চরিত্রের আমরা সমালোচনা করিব। বিষ্ণুপুরাণে দুইটি ভক্তের কথা আছে, সকলেই জানেন—ধ্রুব ও প্রহ্লাদ। এই দুই জনের ভক্তি দুই প্রকার। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছ উপাসনা দ্বিবিধ, সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম যে উপাসনা সেই কাম্য কর্ম্ম; নিষ্কাম যে উপাসনা সেই ভক্তি। ধ্রুবের উপাসনা সকাম,—তিনি উচ্চপদ লাভের জন্যই বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার কৃত উপাসনা প্রকৃত ভক্তি নহে; ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা নিষ্কাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্য ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হয়েন নাই; বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হওয়াতে, বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি সেই সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও, তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই। এই নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ ভক্তি এবং প্রহ্লাদই পরমভক্ত। বোধ হয় গ্রন্থকার সকাম ও নিষ্কাম উপাসনার উদাহরণস্বরূপ, এবং পরস্পরের তুলনার জন্য ধ্রুব ও প্রহ্লাদ এই দুইটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার রাজযোগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি তোমার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, সকাম উপাসনাও একেবারে নিষ্ফল নহে। যে যাহা কামনা করিয়া উপাসনা করে, সে তাহা পায়, কিন্তু ঈশ্বর পায় না। ধ্রুব উচ্চপদ কামনা করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার সে উপাসনা নিম্নশ্রেণীর উপাসনা, ভক্তি নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা ভক্তি, এই জন্য তিনি লাভ করিলেন —মুক্তি।

শিষ্য। অনেকেই বলিবে, লাভটা ধ্রুবেরই বেশী হইল। মুক্তি পারলৌকিক লাভ, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে। এরূপ ভক্তিধর্ম্ম লোকায়ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

গুরু। মুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। ইহলোকেই মুক্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত, সেই ইহলোকেই মুক্ত। সম্রাট্ দুঃখের অতীত নহেন, কিন্তু মুক্ত জীব ইহলোকেই দুঃখের অতীত; কেন না, সে আত্মজয়ী হইয়া বিশ্বজয়ী হইয়াছে। সম্রাটের কি সুখ বলিতে পারি না। বড় বেশী সুখ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যে মুক্ত, অর্থাৎ সংযতাত্মা, বিশুদ্ধচিত্ত, তাহার মনের সুখের সীমা নাই। যে মুক্ত, সেই ইহজীবনেই সুখী। এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম যে সুখের উপায় ধর্ম্ম। মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সামঞ্জস্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সে মুক্ত। যাহার বৃত্তিসকল স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত নহে, সে অজ্ঞান, অসামর্থ্য, বা চিত্তমালিন্যবশত মুক্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। আমার বিশ্বাস যে এই জীবন্মুক্তির কামনা করিয়া ভারতবর্ষীয়েরা এরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন। যাঁহারাই এ প্রকার জীবন্মুক্ত, সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ তাঁহাদের মনোযোগ থাকে না; এজন্য ভারতবর্ষের এই অবনতি হইয়াছে।

গুরু। মুক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য না বুঝাই এই অধঃপতনের কারণ। যাঁহারা মুক্ত বা মুক্তিপথের পথিক, তাঁহারা সংসারে নির্লিপ্ত হয়েন, কিন্তু তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের কর্ম্ম নিষ্কাম বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম স্বদেশের এবং জগতের মঙ্গলকর হয়; সকামকর্ম্মীদিগের কর্ম্মে কাহারও মঙ্গল হয় না। আর তাঁহাদের বৃত্তি সকল অনুশীলিত এবং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, এই জন্য তাঁহারা দক্ষ এবং কর্ম্মঠ; পূর্ব্বে যে ভগবদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখিবে যে, ভগবদ্ভক্তদিগের দক্ষতা * একটি লক্ষণ। তাঁহারা দক্ষ অথচ নিষ্কামকর্ম্মী, এজন্য তাঁহাদিগের দ্বারা যতটা স্বজাতির এবং জগতের মঙ্গল সিদ্ধ হয়, এত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। এ দেশের সকলে এইরূপ মুক্তিমার্গাবলম্বী হইলেই ভারতবর্ষীয়েরাই জগতে শ্রেষ্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে। মুক্তিতত্ত্বের এই যথার্থ ব্যাখ্যার লোপ হওয়ায় অনুশীলনবাদের দ্বারা আমি তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।

শিষ্য। এক্ষণে প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতে বাসনা করি।

গুরু। প্রহ্লাদচরিত্র সবিস্তারে বলিবার আমার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই। তবে একটা কথা এই প্রহ্লাদচরিত্রে বুঝাইতে চাই। আমি বলিয়াছি যে, কেবল, হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া বেড়াইলে ভক্তি হইল না। যে আত্মজয়ী, সর্ব্বভূতকে

* অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।

আপনার মত দেখিয়া সর্ব্বজনের হিতে রত, শত্রু মিত্রে সমদর্শী, নিষ্কামকর্ম্মী,—সেই ভক্ত। এই কথা ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে দেখাইয়াছি। এই প্রহ্লাদ তাহার উদাহরণ। ভগবদ্গীতায় যাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত। গীতায় ভক্তের যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা যদি তুমি বিস্মৃত হইয়া থাক, সেই জন্য তোমাকে উহা আর একবার শুনাইতেছি।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

গীতা ১২। ১৩-২০

প্রথমেই প্রহ্লাদকে "সর্ব্বত্র সমদৃগ্ বশী" বলা হইয়াছে।

সমচেতা জগত্যস্মিন্ যঃ সর্ব্বেষ্বেব জন্তুষু।
যথাত্মনি তথান্যত্র পরং মৈত্রগুণান্বিতঃ॥
ধর্ম্মাত্মা সত্যশৌচাদিগুণা... মাকরস্তথা।
উপমানমশেষাণাং সাধূনাং যঃ সদাভবৎ॥

কিন্তু কথায় গুণবাদ করিলে কিছু হয় না, কার্য্যতঃ দেখাইতে হয়। প্রহ্লাদের প্রথম কার্য্যে দেখি, তিনি সত্যবাদী। সত্যে তাঁহার এতটা দার্ঢ্য যে, কোন প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া তিনি সত্য পরিত্যাগ করেন না। গুরুগৃহ হইতে তিনি পিতৃসমীপে আনীত হইলে, হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শিখিয়াছ? তাহার সার বল দেখি।"

প্রহ্লাদ বলিলেন, "যাহা শিখিয়াছি তাহার সার এই যে, যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই—যাঁহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই—যিনি অচ্যুত, মহাত্মা, সর্ব্ব কারণের কারণ, তাঁহাকে নমস্কার।"

শুনিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপু আরক্ত লোচনে, কম্পিতাধরে প্রহ্লাদের গুরুকে ভর্ৎসনা করিলেন। গুরু বলিল, "আমার দোষ নাই, আমি এ সব শিখাই নাই।"

তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কে শিখাইল রে?"

প্রহ্লাদ বলিল, "পিতঃ! যে বিষ্ণু এই অনন্ত জগতের শাস্তা, যিনি আমার হৃদয়ে স্থিত, সেই পরমাত্মা ভিন্ন আর কে শিখায়?"

হিরণ্যকশিপু বলিলেন, "জগতের ঈশ্বর আমি ; বিষ্ণু কে রে দুর্ব্বুদ্ধি!"

প্রহ্লাদ বলিল, "যাঁহার পরংপদ শব্দে ব্যক্ত করা যায় না, যাঁহার পরংপদ যোগীরা ধ্যান করে, যাঁহা হইতে বিশ্ব, এবং যিনিই বিশ্ব, সেই বিষ্ণু পরমেশ্বর।"

হিরণ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "মরিবার ইচ্ছা করিয়াছিস্ যে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেছিস্? পরমেশ্বর কাহাকে বলে জানিস্ না? আমি থাকিতে আবার তোর পরমেশ্বর কে?"

নির্ভীক প্রহ্লাদ বলিল, "পিতঃ, তিনি কি কেবল আমারই পরমেশ্বর। সকল জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর,—তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাতা, পরমেশ্বর। রাগ করিও না, প্রসন্ন হও।"

হিরণ্যকশিপু বলিল, "বোধ হয়, কোন পাপাশয় এই দুর্ব্বুদ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে।"

প্রহ্লাদ বলিল, "কেবল আমার হৃদয়ে কেন? তিনি সকল লোকেতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই সর্ব্বস্বামী বিষ্ণু, আমাকে, তোমাকে, সকলকে, সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন।"

এখন, সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর। "যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।"* দৃঢ়নিশ্চয় কেন তাহা বুঝিলে? সেই "হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ" স্মরণ কর। এখন, ভয় হইতে মুক্ত যে ভক্ত, সে কি প্রকার তাহা বুঝিলে? "ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ" কি বুঝিলে?† ভক্তের সেই সকল লক্ষণ বুঝাইবার জন্য এই প্রহ্লাদচরিত্র কহিতেছি।

---

* সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

† ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তাড়াইয়া দিলেন, প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে গেলেন। অনেক কালের পর আবার আনাইয়া অধীত বিদ্যার আবার পরীক্ষা লইতে বসিলেন। প্রথম উত্তরেই প্রহ্লাদ আবার সেই কথা বলিল,

কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। শত শত দৈত্য তাঁহাকে কাটিতে আসিল, কিন্তু প্রহ্লাদ "দৃঢ়নিশ্চয়" "ঈশ্বরার্পিত মনোবুদ্ধি"—যাহারা মারিতে আসিল, প্রহ্লাদ তাহাদিগকে বলিল, "বিষ্ণু তোমাদের অস্ত্রেও আছেন, আমাতেও আছেন, এই সত্যানুসারে, আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইব না।" ইহাই "দৃঢ়নিশ্চয়"।

শিষ্য। জানি যে বিষ্ণুপুরাণের উপন্যাসে আছে যে, প্রহ্লাদ অস্ত্রের আঘাতে অক্ষত রহিলেন। কিন্তু উপন্যাসেই এমন কথা থাকিতে পারে,—যথার্থ এমন ঘটনা হয় না। যে যেমন ইচ্ছা ঈশ্বরভক্ত হউক, নৈসর্গিক নিয়ম তাহার কাছে নিষ্ফল হয় না—অস্ত্রে পরম-ভক্তেরও মাংস কাটে।

গুরু। অর্থাৎ তুমি Miracle মান না। কথাটা পুরাতন। আমি তোমাদের মত, ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি। বিষ্ণুপুরাণে যেরূপে প্রহ্লাদের রক্ষা কথিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বলিয়াই সেই বর্ণনা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু একটি নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানু-কম্পায় নিয়মান্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার না। অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত, ঈশ্বরানুকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি এরূপে প্রযুক্ত করিতে পারে, যে অস্ত্র নিষ্ফল হয়। বিশেষ, যে ভক্ত, সে "দক্ষ"; ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহার সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত, সুতরাং সে অতিশয় কার্য্যক্ষম; ইহার উপর ঈশ্বরানুগ্রহ পাইলে সে যে নৈসর্গিক নিয়মের সাহায্যেই, অতিশয় বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, ইহা অসম্ভব কি?* যাহাই হউক, এ সকল কথায় আমাদিগের কোন প্রয়োজন এক্ষণে দেখা যাইতেছে না,—কেন না, আমি ভক্তি বুঝাইতেছি, ভক্ত কি প্রকারে ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হন, বা হন কি না, তাহা বুঝাইতেছি না।

* ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য সিপাহী হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধার বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সময়ে মেঘোদয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ; অবশিষ্ট ভক্তের নিজের দক্ষতা। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে পাঠক এই ভক্তিব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

এরূপ কোন ফলই ভক্তের কামনা করা উচিত নহে,—তাহা হইলে তাঁহার ভক্তি নিষ্কাম হইবে না।

শিষ্য। কিন্তু প্রহ্লাদ ত এখানে রক্ষা কামনা করিলেন—

গুরু। না, তিনি রক্ষা কামনা করেন নাই। তিনি কেবল ইহাই মনে স্থির বুঝিলেন যে, যখন আমার আরাধ্য বিষ্ণু আমাতেও আছেন, এই অস্ত্রেও আছেন, তখন এ অস্ত্রে কখন আমার অনিষ্ট হইবে না। সেই দৃঢ়নিশ্চয়তাই আরও স্পষ্ট হইতেছে। কেবল ইহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য। প্রহ্লাদচরিত্র যে উপন্যাস তদ্বিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্যাসে নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? উপন্যাসে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানস ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই অতিপ্রকৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

তার পর অস্ত্রে প্রহ্লাদ মরিল না দেখিয়া, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিলেন, "ওরে দুর্বুদ্ধি, এখনও শত্রুস্তুতি হইতে নিবৃত্ত হ। বড় মূর্খ হইস্ না, আমি এখনও তোকে অভয় দিতেছি।"

অভয়ের কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ বলিল, "যিনি সকল ভয়ের অপহারী, যাঁহার স্মরণে জন্ম জরা যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের?"

সেই "ভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো" কথা মনে কর। তার পর হিরণ্যকশিপু, সর্পগণকে আদেশ করিলেন যে উহাকে দংশন কর। কথাটা উপন্যাস, সুতরাং এরূপ বর্ণনায় ভরসা করি তুমি বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়েও প্রহ্লাদ মরিল না,—সে কথাও তোমার বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই। কিন্তু যে কথার জন্য পুরাণকার এই সর্পদংশন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোযোগ কর।

স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দশ্যমানো মহোরগৈঃ।
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ॥

প্রহ্লাদের মন কৃষ্ণে তখন এমন আসক্ত যে; মহাসর্প সকল দংশন করিতেছে, তথাপি কৃষ্ণস্মৃতির আহ্লাদে তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই আহ্লাদের জন্য সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্বাক্য আবার স্মরণ কর "সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।" "ক্ষমী" কি, পরে বুঝিবে, এখন "সমদুঃখসুখ" বুঝিলে?

শিষ্য। বুঝিলাম এই যে, ভক্তের মনে বড় একটা ভারি সুখ রাত্রি দিন রহিয়াছে বলিয়া, অন্য সুখ দুঃখ, সুখ দুঃখ বলিয়াই বোধ হয় না।

গুরু। ঠিক তাই। সর্প কর্তৃক প্রহ্লাদ বিনষ্ট হইল না, দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মত্ত হস্তিগণকে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দাঁতে ফাড়িয়া মারিয়া ফেল। হস্তীদিগের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, প্রহ্লাদের কিছু হইল না; বিশ্বাস করিও না—উপন্যাস মাত্র। কিন্তু তাহাতে প্রহ্লাদ পিতাকে কি বলিলেন শুন,—

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাপবিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥

"কুলিশাগ্রকঠিন এই সকল গজদন্ত যে ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা আমার বল নহে। যিনি মহাবিপৎ ও পাপের বিনাশন, তাঁহারই স্মরণে হইয়াছে।"

আবার সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর "নির্মমো নিরহঙ্কারঃ" ইত্যাদি। * ইহাই নিরহঙ্কার। ভক্ত জানে যে সকলই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জন্য ভক্ত নিরহঙ্কার।

হস্তী হইতে প্রহ্লাদের কিছু হইল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু আগুনে পোড়াইতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ আগুনেও পুড়িল না। প্রহ্লাদ "শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ" তাই প্রহ্লাদের সে আগুন পদ্মপত্রের ন্যায় শীতল বোধ হইল। † তখন দৈত্যপুরোহিত ভার্গবেরা দৈত্যপতিকে বলিলেন যে, "ইহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া আমাদের জিম্মা করিয়া দিন। তাহাদেও যদি এ বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমরা অভিচারের দ্বারা ইহাকে বধ করিব। আমাদের কৃত অভিচার কখন বিফল হয় না।"

দৈত্যেশ্বর এই কথায় সম্মত হইলে, ভার্গবেরা প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া, অন্যান্য দৈত্যগণের সঙ্গে পড়াইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ সেখানে নিজে একটি ক্লাস খুলিয়া বসিলেন। এবং দৈত্যপুত্রগণকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বিষ্ণুভক্তিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি আর কিছুই নহে—পরহিতব্রত মাত্র—

বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্ব্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥

* * *

---

* নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।

† শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।

সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥

অর্থাৎ বিশ্ব, জগৎ, সর্ব্বভূত, বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র; বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। * * হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্ব্বত্র সমান দেখিও, এই সমত্ব (আপনার সঙ্গে সর্ব্বভূতের) ঈশ্বরের আরাধনা।

প্রহ্লাদের উক্তি বিষ্ণুপুরাণ হইতে তোমাকে পড়িতে অনুরোধ করি। এখন কেবল আর দুইটি শ্লোক শুন।

অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্।
মুদং তথাপি কুর্ব্বীত হানির্দ্বেষফলং যতঃ॥
বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেত্ততঃ।
শোচ্যান্যহোঽতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা॥

"অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হীনশক্তি ইহা দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, দ্বেষ করিও না, কেন না, দ্বেষে অনিষ্টই হইয়া থাকে। যাহাদের সঙ্গে শত্রুতা বদ্ধ হইয়াছে, তাহাদেরও যে দ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, বলিয়া জ্ঞানীরা দুঃখ করেন।"

এখন সেই ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ মনে কর।

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ" এবং 'ন দ্বেষ্টি' * শব্দ মনে কর। ভগবদ্বাক্যে পুরাণকর্ত্তার কৃত এই টীকা।

প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুভক্তির উপদ্রব করিতেছে, জানিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাকে বিষপান করাইতে আজ্ঞা দিলেন। বিষেও প্রহ্লাদ মরিল না। তখন দৈত্যেশ্বর পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অভিচার-ক্রিয়ার দ্বারা প্রহ্লাদের সংহার করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা প্রহ্লাদকে একটু বুঝাইলেন; বলিলেন—তোমার পিতা জগতের ঈশ্বর, তোমার অনন্তে কি হইবে? প্রহ্লাদ "স্থিরমতি" †; প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তখন দৈত্য-পুরোহিতেরা ভয়ানক অভিচার-ক্রিয়ার সৃষ্টি করিলেন। অগ্নিময়ী মূর্ত্তিমতী অভিচার-ক্রিয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূলাঘাত করিল। প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মূর্ত্তিমান্ অভিচার, নিরপরাধ প্রহ্লাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অভিচারকারী পুরোহিতদিগকেই ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহ্লাদ

* যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

† অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।

"হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! ইহাদের রক্ষা কর" বলিয়া সেই দহ্যমান পুরোহিতদিগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। ডাকিলেন, হে সর্ব্বব্যাপিন্, হে জগৎস্বরূপ, হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, হে জনার্দ্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর। যেমন সকল ভূতে সর্ব্বব্যাপী, জগদ্‌গুরু বিষ্ণু তুমি আছ, তেমনই এই ব্রাহ্মণেরা জীবিত হউক। বিষ্ণু সর্ব্বগত বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি শত্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমনি—ইহারাও জীবিত হৌক। যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতীর দ্বারা আমাকে আহত করিয়াছিল, সাপের দ্বারা দংশিত করিয়াছিল, আমি তাহাদের মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শত্রু মনে করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতেরা জীবিত হউক।" তখন ঈশ্বরকৃপায় পুরোহিতেরা জীবিত হইয়া, প্রহ্লাদকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল।

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম, অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার?*

শিষ্য। আমি স্বীকার করি দেশীয় গ্রন্থ সকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজি পড়ায় আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে।

গুরু। এখন ভগবদ্গীতায় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং শত্রু মিত্রে তুল্যজ্ঞানী বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকার, তাহা বুঝিলে? †

পরে, হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এই প্রভাব কোথা হইতে হইল?" প্রহ্লাদ বলিলেন, "অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না—কারণাভাব বশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না। যে কর্ম্মের দ্বারা, মনে বা বাক্যে পরপীড়ন করে, তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফলিয়া থাকে।

কেশব আমাতেও আছেন, সর্ব্বভূতেও আছেন, ইহা জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করি না, কাহারও মন্দ করি না, কাহাকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের শুভ চিন্তা

---

* মনস্বী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বপ্রণীত "Oriental Christ" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "A suppliant for mercy on behalf of those very men who put him to death, he said—'Father ! forgive them, for they know not what they do.' Can ideal forgiveness go any futher ?" *Ideal* যায় বৈ কি, এই প্রহ্লাদচরিত্র দেখুন না।

† সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।

করি, আমার শারিরীক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটিবে? হরি সর্ব্বময় জানিয়া সর্ব্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য।"

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? বিদ্যালয়ে এ সকল না পড়াইয়া, পড়ায় কি না, মেকলে প্রণীত ক্লাইব ও হেষ্টিংস সম্বন্ধীয় পাপপূর্ণ উপন্যাস। আর সেই উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী উন্মত্ত।

পরে, প্রহ্লাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যপতি তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, শম্বরাসুরের মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বারা প্রহ্লাদের বিনাশের চেষ্টা করিলেন। প্রহ্লাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতিশিক্ষার জন্য তাহাকে পুনশ্চ গুরুগৃহে পাঠাইলেন। সেখানে নীতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচার্য্য প্রহ্লাদকে সঙ্গে করিয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া আসিলেন। দৈত্যেশ্বর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—

"হে প্রহ্লাদ! মিত্রের ও শত্রুর প্রতি ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তিন সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন? মন্ত্রী বা অমাত্যের সঙ্গে বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে,—চর, চৌর, শঙ্কিতে এবং অশঙ্কিতে,—সন্ধি বিগ্রহে, দুর্গ ও আটবিক সাধনে বা কণ্টকশোধনে—কিরূপ করিবেন, তাহা বল।"

প্রহ্লাদ পিতৃপদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "গুরু সে সব কথা শিখাইয়াছেন বটে, আমিও শিখিয়াছি। কিন্তু সে সকল নীতি আমার মনোমত নহে। শত্রু মিত্রের সাধন-জন্য সাম দান ভেদ দণ্ড এই সকল উপায় কথিত হইয়াছে, কিন্তু পিতঃ! রাগ করিবেন না, আমি ত সেরূপ শত্রু মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য নাই,* সেখানে সাধনের কি প্রয়োজন। যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ব্বভূতাত্মা, তখন আর শত্রু মিত্র কে? তোমাতে ভগবান্ আছেন, আমাতে আছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই শত্রু, এমন করিয়া পৃথক্ ভাবিব কি প্রকারে? অতএব দুষ্ট-চেষ্টা-বিধি-বহুল এই নীতিশাস্ত্রে কি প্রয়োজন?"

হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। এবং প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে অসুরগণকে আদেশ করিলেন। অসুরেরা প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্ব্বত চাপা দিল। প্রহ্লাদ তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিতে লাগিলেন, কেন না, অন্তিমকালে ঈশ্বরচিন্তা বিধেয়; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না, কেন না প্রহ্লাদ

* অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে কাহাকেও শত্রু মনে করা উচিত নহে।

নিষ্কাম। প্রহ্লাদ ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাতে লীন হইলেন। প্রহ্লাদ যোগী *। তখন তাঁহার নাগপাশ খসিয়া গেল, সমুদ্রের জল সরিয়া গেল; পর্ব্বত সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদ গাত্রোত্থান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন,—আত্মরক্ষার জন্য নহে, নিষ্কাম হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন তাঁহাকে দর্শন দিলেন। এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বরপ্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ "সন্তুষ্টঃ সততং" সুতরাং তাঁহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই নাই। অতএব তিনি কেবল চাহিলেন যে, "যে সহস্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, সে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে।" ভক্ত ভক্তিই প্রার্থনা করে, ভক্তির জন্য ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্য বা অন্য ইষ্টসাধনের জন্য নহে।

ভগবান্ কহিলেন, "তাহা আছে ও থাকিবে। অন্য বর দিব প্রার্থনা কর।"

প্রহ্লাদ দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করিলেন, "আমি তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম বলিয়া, পিতা আমার যে দ্বেষ করিয়াছিলেন, তাঁর সেই পাপ ক্ষালিত হউক।"

ভগবান্ তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু নিষ্কাম প্রহ্লাদের জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না, কেন না তিনি "সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী,—হর্ষ, দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, শুভাশুভ পরিত্যাগী।"† তিনি আবার চাহিলেন, "তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যভিচারিণী থাকে।"

বর দিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তার পর হিরণ্যকশিপু আর প্রহ্লাদের উপর অত্যাচার করেন নাই।

শিষ্য। তুলামানে এক দিকে বেদ, নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল, কোরাণ আর এক দিকে প্রহ্লাদচরিত্র রাখিলে প্রহ্লাদচরিত্রই গুরু হয়।

গুরু। এবং প্রহ্লাদকথিত এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা ধর্ম্মের সার, সুতরাং সকল বিশুদ্ধ ধর্ম্মেই আছে। যে পরিমাণে যে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ, ইহা সেই পরিমাণে সেই ধর্ম্মে আছে। খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্গত। গড্ বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ

---

* সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

† সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপাল-জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও, তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধম ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর হিন্দুয়ানি যায়।

বিংশতিতম অধ্যায়।—ভক্তি।

ভক্তির সাধন।

শিষ্য। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাস্য যে, আপনার নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম, তাহা সাধন না সাধ্য?

গুরু। ভক্তি, সাধন ও সাধ্য। ভক্তি মুক্তিপ্রদা, এজন্য ভক্তি সাধন। আর ভক্তি মুক্তিপ্রদা হইলেও মুক্তি বা কিছুই কামনা করে না, এজন্য ভক্তিই সাধ্য।

শিষ্য। তবে, এই ভক্তির সাধন কি শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহার অনুশীলন প্রথা কি? উপাসনাই ভক্তির সাধন বলিয়া চিরপ্রথিত, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা যদি যথার্থ হয়, তবে ইহাতে উপাসনার কোন স্থান দেখিতেছি না।

গুরু। উপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্তু উপাসনা কথাটা অনেক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে? তুমি অনুদিন সমস্ত কার্য্যে ঈশ্বরকে আন্তরিক চিন্তা না করিলে কখনই তাহা পারিবে না।

শিষ্য। তথাপি হিন্দুশাস্ত্রে এই ভক্তির অনুশীলনের কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি যে ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইলেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভক্তি হইলেও হিন্দুদিগের মধ্যে বিরল। হিন্দুর মধ্যে ভক্তি আছে; কিন্তু সে আর এক রকমের। প্রতিমা গড়িয়া, তাহার সম্মুখে যোড়হাত করিয়া, পট্টবস্ত্র গলদেশে দিয়া গদগদভাবে অশ্রুমোচন, "হরি! হরি!" বা "মা! মা!" ইত্যাদি শব্দে উচ্চতর গোলযোগ,

অথবা রোদন, এবং প্রতিমার চরণামৃত পাইলে তাহা মাথায়, মুখে, চোখে, নাকে, কাণে,—

গুরু। তুমি যাহা বলিতেছ বুঝিয়াছি। উহাও চিত্তের উন্নত অবস্থা, উহাকে উপহাস করিও না। তোমার হক্সলী, টিণ্ডল অপেক্ষা ওরূপ এক জন ভাবুক আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তুমি গৌণ ভক্তির কথা তুলিতেছ।

শিষ্য। আপনার পূর্ব্বকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছি যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না।

গুরু। ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গৌণ বা নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল হিন্দু-শাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহাতে সে সকল পরিপূর্ণ।

শিষ্য। গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মুখ্য ভক্তিতত্ত্বেরই প্রচার থাকাতেও আধুনিক শাস্ত্রে গৌণ ভক্তি কি প্রকারে আসিল ?

গুরু। ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা, এবং কর্ম্মাত্মিকা, ভরসা করি, ইহা বুঝিয়াছ। ভক্তি উভয়াত্মিকা বলিয়া, তাহার অনুশীলনে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরে সমর্পিত করিতে হয়। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। যখন ভক্তি কর্ম্মাত্মিকা এবং কর্ম্ম সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, তখন কাজেই কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম, তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ হইলেই ঐ বৃত্তি ঈশ্বরমুখী হইল। কিন্তু অনেক শাস্ত্রকারেরা অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাঁহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক ভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। হরিনামের কথা হইতেছে,—

বিলেবতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত নযোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ॥
ভার পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌনো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরেল্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা।
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ননিরীক্ষতে যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যা শ্বসঞ্ছবো যস্ত নবেদ গন্ধং॥

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

ভাগবত, ২ স্ক, ৩ অ, ২০—২৪।

"যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ না করে, হায়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা গর্ত্ত মাত্র। হে সূত! যে হরিগাথা গান না করে, তাহার অসতী জিহ্বা ভেকজিহ্বা তুল্যা। যাহার মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহা পট্ট-কিরীট-শোভিত হইলেও বোঝা মাত্র। যাহার হস্তদ্বয় হরির সপর্য্যা না করে, তাহা কনক কঙ্কণে শোভিত হইলেও মড়ার হাত মাত্র। মনুষ্যদিগের চক্ষুর্দ্বয় যদি বিষ্ণুমূর্ত্তি* নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা ময়ূরপুচ্ছ মাত্র। আর যে চরণদ্বয় হরিতীর্থে পর্য্যটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ হইয়াছে মাত্র। আর যে ভগবৎ-পদরেণু ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব। বিষ্ণু-পাদার্পিত তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, সে নিশ্বাস থাকিতেও শব। হায়! হরিনামকীর্ত্তনে যাহার হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত না হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় লৌহময়।"

এই শ্রেণীর ভক্তেরা এইরূপে ঈশ্বরে বাহ্যেন্দ্রিয় সমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা সাকারোপসনাসাপেক্ষ। নিরাকারে চক্ষুপাণিপাদের এরূপ নিয়োগ অঘটনীয়।

শিষ্য। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই। ভক্তির প্রকৃত সাধন কি?

গুরু। তাহা ভগবান্ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়॥ ১২। ৬—৮

"হে অর্জ্জুন! যাহারা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হয়, এবং অন্য ভজনারহিত যে ভক্তিযোগ তদ্দ্বারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার হইতে সেই আমাতে নিবিষ্টচেতাদিগের আমি অচিরে উদ্ধারকর্ত্তা হই। আমাতে তুমি

---

* এখানে "লিঙ্গানি বিষ্ণোঃ" অর্থে বিষ্ণুর মূর্ত্তি সকল। অতি সঙ্গত অর্থ। তবে শিবলিঙ্গের কেবল সেই অর্থ না করিয়া, কদর্য্য উপন্যাস ও উপাসনা পদ্ধতিতে যাই কেন?

মনস্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি দেহান্তে আমাতেই অধিষ্ঠান করিবে।"

শিষ্য। বড় কঠিন কথা। এইরূপ ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে কয় জন পারে?

গুরু। সকলেই পারে। চেষ্টা করিলেই পারে।

শিষ্য। কি প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে?

গুরু। ভগবান্ তাহাও অর্জ্জুনকে বলিয়া দিতেছেন,

> অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
> অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ১২। ৯

"হে অর্জ্জুন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিতে না পার, তবে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।" অর্থাৎ যদি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে পুনঃপুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্য্য অভ্যস্ত করিবে।

শিষ্য। অভ্যাস মাত্রই কঠিন, এবং এ গুরুতর অভ্যাস আরও কঠিন। সকলে পারে না। যাহারা না পারে, তাহারা কি করিবে?

গুরু। যাহারা কর্ম্ম করিতে পারে, তাহারা যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, বা ঈশ্বরানুমোদিত, সেই সকল কর্ম্ম সর্ব্বদা করিলে ক্রমে ঈশ্বরে মনস্থির হইবে। তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন—

> অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
> মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১২। ১০

"যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম্ম সকল করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।"

শিষ্য। কিন্তু অনেকে কর্ম্মেও অপটু—বা অকর্ম্মা। তাহাদের উপায় কি?

গুরু। এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান্ বলিতেছেন,—

> অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
> সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১২। ১১

"যদি মদাশ্রিত কর্ম্মেও অশক্ত হও, তবে যতাত্মা হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগ কর।"

শিষ্য। সে কি? যে কর্ম্মে অক্ষম, যাহার কোন কর্ম্ম নাই, সে কর্ম্মফল ত্যাগ করিবে কি প্রকারে?

গুরু। কোন জীবই একেবারে কর্ম্মশূন্য হইতে পারে না। যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম না করে, ভূততাড়িত হইয়া সেও কর্ম্ম করিবে। এ বিষয়ে ভগবদুক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত

করিয়াছি। যে কর্ম্মই তদ্দ্বারা সম্পন্ন হয়, যদি কর্ম্মকর্ত্তা তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা না করে, তবে অন্য কামনাভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবেন। তখন আপনা হইতেই চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে।

শিষ্য। এই চতুর্ব্বিধ সাধনই অতি কঠিন। আর ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

গুরু। এই চতুর্ব্বিধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ঈদৃশ সাধকদিগের পক্ষে অন্যবিধ উপাসনার প্রয়োজন নাই।

শিষ্য। কিন্তু অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক, প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে। তাহারা কি ভক্তির অধিকারী নহে?

গুরু। এই সব স্থলে উপাসনাত্মিকা গৌণ ভক্তির প্রয়োজন। গীতায় ভগবদুক্তি আছে যে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং

"যে যে রূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপে ভজনা করি।"

এবং স্থানান্তরে বলিয়াছেন,

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

"যে ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহা প্রযতাত্মার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করি।"

শিষ্য। তবে কি গীতায় সাকার মূর্ত্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে?

গুরু। ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন।

শিষ্য। প্রতিমাদির পূজা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মে নিষিদ্ধ, না বিহিত?

গুরু। অধিকারী ভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত। তদ্বিষয়ে ভাগবত পুরাণ হইতে কপিলোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ভাগবত পুরাণে কপিল, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। তিনি তাঁহার মাতা দেবহূতীকে নির্গুণ ভক্তিযোগের সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের মধ্যে এক দিকে, সর্ব্বভূতে ঈশ্বরচিন্তা, দয়া, মৈত্র, যম নিয়মাদি ধরিয়াছেন, আর এক দিকে প্রতিমা দর্শন, স্পর্শন, পূজাদি ধরিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন,—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
৩ স্ক। ২৯ অ। ১৭। ১৮।

"আমি, সর্ব্বভূতে ভূতাত্মা স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া) মনুষ্য প্রতিমাপূজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে আত্মাস্বরূপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।"

পুনশ্চ,

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং॥
২৯ অ। ২০

যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মে রত, সে যত দিন না আপনার হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদি পূজা করিবে।

বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, তাহার প্রতিমাদির অর্চ্চনা বিড়ম্বনা। আর যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদি পূজা নিষ্প্রয়োজনীয়। তবে যত দিন সে জ্ঞান না জন্মে, তত দিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা অবিহিত নহে, কেন না তদ্দারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমা পূজা গৌণভক্তির মধ্যে।

শিষ্য। গৌণভক্তি কাহাকে বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতেছি না।

গুরু। মুখ্যভক্তির অনেক বিঘ্ন আছে। যাহাদ্বারা সেই সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় শাণ্ডিল্যসূত্রপ্রণেতা তাহারই নাম দিয়াছেন গৌণভক্তি। ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন, ফল পুষ্পাদির দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা, বন্দনা, প্রতিমাদির পূজা—এ সকল গৌণভক্তির লক্ষণ। সূত্রের টীকাকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল অনুষ্ঠান ভক্তিজনক মাত্র; ইহার ফলান্তর নাই।*

শিষ্য। তবে আপনার মত এই বুঝিলাম যে পূজা, হোম, যজ্ঞ, নামসঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার ঐহিক বা পারমার্থিক ফল নাই,—ঐ সকল কেবল ভক্তির সাধন মাত্র।

* ভক্ত্যা কীর্ত্তনেন ভক্ত্যা দানেন পরাভক্তিং সাধয়েদিতি। ন ফলান্তরার্থং গৌরবাদিতি।

গুরু। তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন যাহা তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পূজাদি করিবে। তবে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বরচিন্তাই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মুখ্যভক্তির লক্ষণ। যথা বিপন্মুক্ত প্রহ্লাদকৃত বিষ্ণু-স্তুতি মুখ্যভক্তি। আর "আমার পাপ ক্ষালিত হউক," "আমার সুখে দিন যাউক," ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তুতি বা Prayer, গৌণভক্তি মধ্যে গণ্য। আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের কর্ম্মতৎপর হও।

শিষ্য। সেও ত পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ—

গুরু। সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্য কর্ম্ম নহে; এ সকল সাধকের নিজ মঙ্গলোদ্দিষ্ট কর্ম্ম—সাধকের নিজের কার্য্য; ভক্তির বৃদ্ধি জন্যও যদি এ সকল কর, তথাপি তোমার নিজের জন্যই হইল। ঈশ্বর জগন্ময়; জগতের কাজই তাঁহার কাজ। অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্ম্মই কৃষ্ণোক্ত "মৎকর্ম্ম"; তাহার সাধনে তৎপর হও, এবং সমস্ত বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের দ্বারায় সে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও। তাহা হইলে যাঁহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ম্ম, তাঁহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত হইবে। জীবন্মুক্তিই সুখ। বলিয়াছি, "সুখের উপায় ধর্ম্ম।" এই জীবন্মুক্তি সুখের উপায়ই ধর্ম্ম। রাজসম্পদাদি কোন সম্পদেই তত সুখ নাই।

যে ইহা না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পূজা, নামকীর্ত্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্ব্যতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহ্যাড়ম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না হইয়া কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্তু, যে কোন প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের প্রভেদ অল্প।

শিষ্য। তবে, এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয় ভণ্ড ও শঠ, নয় পশুবৎ।

গুরু। হিন্দুর অবনতির এই একটা কারণ। কিন্তু তুমি দেখিবে শীঘ্রই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমওয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা মহম্মদের সমকালিক আরবের মত, অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিবে।

শিষ্য। কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি।

একবিংশতিতম অধ্যায়।—প্রীতি।

শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য হিন্দুগ্রন্থের ভক্তিব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তাহা এই অনুশীলন ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভাগবত পুরাণেও ভক্তিতত্ত্বের অনেক কথা আছে। কিন্তু ভগবদ্গীতাতেই সে সকলের মূল। এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থেও যাহা আছে, সেও গীতামূলক। অতএব সে সকলের পর্য্যালোচনায় কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু অনুশীলন ধর্ম্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে, বরং একটুখানি বিরোধ আছে। অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।

শিষ্য। তবে এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন।

গুরু। ভক্তিবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে প্রীতিরও আসল কথা বলিয়াছি। মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। প্রহ্লাদচরিত্রে প্রহ্লাদোক্তিতে ইহা বিশেষ বুঝিয়াছ। অন্য ধর্ম্মের এ মত হোক না হোক, হিন্দুধর্ম্মের এই মত। প্রীতির অনুশীলনের দুইটি প্রণালী আছে। একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয়, আর একটি আধ্যাত্মিক বা ভারতবর্ষীয়। আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথা এখন থাক। আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম বুঝি তাহা বুঝাইতেছি। প্রীতি দ্বিবিধ, সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মনুষ্যের প্রতি প্রীতি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা পিতার, বা মাতা পিতার প্রতি সন্তানের। ইহাই সহজ প্রীতি। আর কতকগুলির প্রতি প্রীতি সংসর্গজ, যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের, বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং সংসর্গজ প্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি। এই পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না, যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি। পুত্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে স্বতই প্রবৃত্ত, এই জন্য পরিবার হইতে প্রথম প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অতএব পারিবারিক জীবন ধার্ম্মিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারেরা শিক্ষা-নবিশীর পরেই গার্হস্থ্য আশ্রম অবশ্য পালনীয় বলিয়া অনুজ্ঞাত করিয়াছিলেন।

পারিবারিক অনুশীলনে প্রীতিবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে স্ফুরিত হইলে পরিবারের বাহিরেও বিস্তার কামনা করে। বলিয়াছি যে প্রীতিবৃত্তি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় অধিকতর

স্ফুরণক্ষম; সুতরাং অনুশীলিত হইতে থাকিলেই ইহা গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইয়া বাহির হইতে চাহিবে। অতএব ইহা ক্রমশঃ কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ, অনুগত, ও আশ্রিতে, গোষ্ঠীতে, গোত্রে সমাবিষ্ট হয়। ইহাতেও অনুশীলন থাকিলে ইহার স্ফূর্ত্তিশক্তি সীমা প্রাপ্ত হয় না। ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরস্থ, দেশস্থ, মনুষ্যমাত্রের উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই প্রীতি বিস্তারিত হয় তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবতী হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। হইলে, ইহা জাতি বিশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রীতিবৃত্তির এই অবস্থা সচরাচর প্রবল দেখা যায়। ইউরোপীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এতটা বেশী হইয়াছে, ইহা তাহার এক কারণ।

শিষ্য। ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য এবং আমাদের দেশে নাই, তাহার কারণ কি আপনি কিছু বুঝাইতে পারেন?

গুরু। উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধর্ম্ম, বিশেষতঃ পূর্ব্বতন ইউরোপের ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের মত উন্নত ধর্ম্ম নহে; ইহাই সেই কারণ। একটু সবিস্তারে সেই কথাটা বুঝাইতেছি, তাহা শুন।

দেশবাৎসল্য প্রীতিবৃত্তির স্ফূর্ত্তির চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা। তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। যত দিন প্রীতির জগৎপরিমিত স্ফূর্ত্তি না হইল, তত দিন প্রীতিও অসম্পূর্ণ—ধর্ম্মও অসম্পূর্ণ।

এখন দেখা যায় যে, ইউরোপীয়দিগের প্রীতি আপনাদের স্বদেশেই পর্য্যবসিত হয়, সমস্ত মনুষ্যলোকে ব্যাপ্ত হইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভাল বাসেন, অন্য জাতীয়কে দেখিতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের স্বভাব। অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা স্বধর্ম্মীকে ভাল বাসে, বিধর্ম্মীকে দেখিতে পারে না। মুসলমান ইহার উদাহরণ। কিন্তু ধর্ম্ম এক হইলে, জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বেষ করে না। মুসলমানের চক্ষে সব মুসলমান প্রায় তুল্য; কিন্তু ইংরেজখ্রীষ্টিয়ান ও রুষখ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে বড় গোলযোগ।

শিষ্য। এস্থলে মুসলমানেরও প্রীতি জাগতিক নহে, ইউরোপের প্রীতিও জাগতিক নহে।

গুরু। মুসলমানের প্রীতি-বিস্তারের নিরোধক তাহার ধর্ম্ম। জগৎসুদ্ধ মুসলমান হইলে জগৎসুদ্ধ সে ভাল বাসিতে পারে, কিন্তু জগৎসুদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান হইলে জর্ম্মাণ জর্ম্মাণ ভিন্ন,
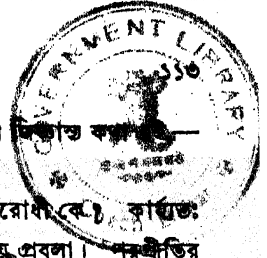
ফরাসি ফরাসি ভিন্ন, আর কাহাকেও ভাল বাসিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য কথা এই—ইউরোপীয় প্রীতি দেশব্যাপক হইয়াও আর উঠিতে পারে না কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বুঝিতে হইবে প্রীতিস্ফূর্ত্তির কার্য্যতঃ বিরোধী কে ? কার্য্যতঃ বিরোধী আত্মপ্রীতি। পশুপক্ষির ন্যায় মনুষ্যেতে আত্মপ্রীতিও অতিশয় প্রবলা। পরপ্রীতির অপেক্ষা আত্মপ্রীতি প্রবলা। এই জন্য উন্নত ধর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শাসিত না হইলে, প্রীতির বিস্তার আত্মপ্রীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পরে প্রীতি যত দূর আত্মপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গত হয়, তত দূরই তাহার বিস্তার হয়, বেশী হয় না। এখন পারিবারিক প্রীতি আত্মপ্রীতির সঙ্গে সুসঙ্গত ; এই পুত্র আমার, এই ভার্য্যা আমার, ইহারা আমার সুখের উপাদান, এই জন্য আমি ইহাদের ভাল বাসি। তারপর কুটুম্ব, বন্ধু, স্বজন, জ্ঞাতি, গোষ্ঠীগোত্রও আমার, আশ্রিত অনুগত ইহারাও আমার, ইহারাও আমার সুখের উপাদান এই জন্য আমি ইহাদের ভাল বাসি। তেমনি, আমার গ্রাম, আমার নগর, আমার দেশ আমি ভাল বাসি। কিন্তু জগৎ আমার নহে, জগৎ আমি ভাল বাসিব না। পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাহার দেশ আমার দেশ হইতে ভিন্ন, কিন্তু এমন কেহই নাই, যাহার পৃথিবী আমার পৃথিবী হইতে ভিন্ন। সুতরাং পৃথিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ভাল বাসিব কেন ?

শিষ্য। কেন ? ইহার কি কোন উত্তর নাই ?

গুরু। ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে। ইউরোপে হিতবাদীদের "Greatest good of the greatest number," কোম্‌তের Humanity পূজা, সর্ব্বোপরি খ্রীষ্টের জাগতিক প্রীতিবাদ, মনুষ্য মনুষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে।

শিষ্য। এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ খ্রীষ্টধর্ম্মের এই উন্নত নীতি থাকিতে, ইউরোপে প্রীতি দেশ ছাড়ায় না কেন ?

গুরু। তাহার কারণানুসন্ধান জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কোন উন্নত ধর্ম্ম ছিল না, যে পৌত্তলিকতা সুন্দরের এবং শক্তিমানের পূজা মাত্র, তাহার উপর আর কোন উচ্চধর্ম্ম ছিল না। জগতের লোক কেন ভাল বাসিব, ইহার কোন উত্তর ছিল না। এই জন্য তাহাদের প্রীতি কখন দেশকে ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই দুই জাতি অতি উন্নতস্বভাব আর্য্যবংশীয় জাতি ছিল ; তাহাদের স্বাভাবিক মহত্ত্বগুণে তাহাদের প্রীতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় বেগবতী ও মনোহারিণী হইয়াছিল। দেশবাৎসল্যে এই দুই জাতি পৃথিবীতে বিখ্যাত।

এখন আধুনিক ইউরোপ খ্রীষ্টিয়ান হৌক আর যাই হৌক, ইহার শিক্ষা প্রধানত প্রাচীন গ্রীস ও রোম হইতে। গ্রীস ও রোম ইহার চরিত্রের আদর্শ। সেই আদর্শ আধুনিক ইউরোপে যতটা আধিপত্য করিয়াছে যীশু তত দূর নহে। আর এক জাতি আধুনিক ইউরোপীয়দিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে। য়িহুদী জাতির কথা বলিতেছি। য়িহুদী জাতিও বিশিষ্ট রূপে দেশবৎসল, লোকবৎসল নহে। এই তিন দিকের ত্রিস্রোতে পড়িয়া ইউরোপ দেশবৎসল হইয়া পড়িয়াছে, লোকবৎসল হইতে পারে নাই। অথচ খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ইউরোপের ধর্ম্ম। তাহাও বর্ত্তমান। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম এই তিনের সমবায়ের অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই রহিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়েরা মুখে লোকবৎসল, অন্তরে ও কার্য্যে দেশবৎসল মাত্র। কথাটা বুঝিলে ?

শিষ্য। প্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশীলন কি তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম ইহাতে প্রীতির পূর্ণস্ফূর্ত্তি হয় না। দেশবাৎসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তার আত্মপ্রীতি আসিয়া আপত্তি উত্থাপিত করে যে, জগৎ ভাল বাসিব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ কি সম্পর্ক ? এক্ষণে প্রীতির পারমার্থিক বা ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের মর্ম্ম কি বলুন।

গুরু। তাহা বুঝিবার আগে ভারতবর্ষীয়ের চক্ষে ঈশ্বর কি তাহা মনে করিয়া দেখ। খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জর্ম্মণি বা রুষিয়ার রাজা সমস্ত জর্ম্মাণ বা সমস্ত রুষ হইতে একটা পৃথক্ ব্যক্তি, খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বরও তাই। তিনিও পার্থিব রাজার মত পৃথক্ থাকিয়া রাজ্যপালন রাজ্যশাসন করেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, এবং লোকে কি করিল পুলিসের মত তাহার খবর রাখেন। তাঁহাকে ভাল বাসিতে হইলে, পার্থিব রাজাকে ভাল বাসিবার জন্য যেমন প্রীতিবৃত্তির বিশেষ বিস্তার করিতে হয় তেমনই করিতে হয়।

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্ব্বভূতময়। তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি জড়জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক্, কিন্তু জগৎ তাঁহাতেই আছে। যেমন সূত্রে মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাঁহাতে জগৎ। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে, সকলেই তিনি বিদ্যমান। আমাতে তিনি বিদ্যমান। আমাকে ভাল বাসিলে তাঁহাকে ভাল বাসিলাম। তাঁহাকে না ভাল বাসিলে আমাকেও ভাল বাসিলাম না। তাঁহাকে ভাল বাসিলে সকল মনুষ্যকেই ভাল বাসিলাম। সকল মনুষ্যকে না ভাল বাসিলে, তাঁহাকে ভাল বাসা হইল না, আপনাকে ভাল বাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির অন্তর্গত না হইলে প্রীতির অস্তিত্বই রহিল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগতই আমি,

যতক্ষণ না বুঝিব যে সর্ব্বলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম্ম হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের মূলেই আছে, অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই। ভগবানের সেই মহাবাক্য পুনরুক্ত করিতেছি :—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি।*

"যে যোগযুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখে এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে দেখে ও সর্ব্বত্র সমান দেখে, যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে, আমাতে সকলকে দেখে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না।"

স্থূল কথা, মনুষ্যে প্রীতি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত ; মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই ; ভক্তি ও প্রীতি হিন্দুধর্ম্মে অভিন্ন, অভেদ্য, ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাকালে ইহা দেখাইয়াছি ; ভগবদগীতা এবং বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত্র হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে উহা দেখিয়াছ। প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শত্রুর সঙ্গে রাজার কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, "শত্রু কে? সকলই বিষ্ণু-(ঈশ্বর)ময়, শত্রু মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়!" প্রীতিতত্ত্বের এইখানে একশেষ হইল। এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্ম্মের উপর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা করি। প্রহ্লাদের সেই সকল উক্তি এবং গীতা হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা পুনর্ব্বার স্মরণ কর। স্মরণ না হয় গ্রন্থ হইতে পুনর্ব্বার অধ্যয়ন কর। তদ্ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মোক্ত প্রীতিতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। এই প্রীতি জগতের বন্ধন, এই প্রীতি ভিন্ন জগৎ বন্ধনশূন্য বিশৃঙ্খল জড়পিণ্ড সকলের সমষ্টি মাত্র। প্রীতি না থাকিলে পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ মনুষ্য জগতে বাস করিতে অক্ষম হইত, অনেক কাল হয়ত পৃথিবী মনুষ্যশূন্য, নয় মনুষ্য লোকের অসহ্য নরক হইয়া উঠিত। ভক্তির পর প্রীতির

---

* এই ধর্ম্ম বৈদিক। বাজসনেয় সংহিতোপনিষদে আছে—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানন্ততো ন বিজুগুপ্সতে।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ,
তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

অপেক্ষা উচ্চবৃত্তি আর নাই। যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে প্রীতিতেও তেমনই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি,—বৃত্তি স্বরূপ জগদাধার হইয়া তিনি লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞানে আমাদিগকে ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এবং অজ্ঞানই আমাদিগকে ভক্তি প্রীতি ভুলাইয়া রাখে। অতএব ভক্তি প্রীতির সম্যক্ অনুশীলন জন্য, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলন আবশ্যক। ফলে সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন ও সামঞ্জস্য ব্যতীত সম্পূর্ণ ধর্ম্ম লাভ হয় না, ইহার প্রমাণ পুনঃপুনঃ পাইয়াছ।

শিষ্য। এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির ভারতবর্ষীয় বা পারমার্থিক অনুশীলনপদ্ধতি বুঝিলাম। জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়া জগতের সঙ্গে তাঁহার এবং আমার অভিন্নতা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ক্রমে সর্ব্বলোককে আপনার মত দেখিতে শিখিলে প্রীতিবৃত্তির পূর্ণস্ফূর্ত্তি হইবে। ইহার ফলও বুঝিলাম। আত্মপ্রীতি ইহার বিরোধী হইবার সম্ভাবনা নাই—কেন না, সমস্ত জগৎ আত্মময় হইয়া যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র হইতে পারে না,—সর্ব্বলোক বাৎসল্যই ইহার ফল। প্রাকৃতিক অনুশীলনের ফল ইউরোপে কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র জন্মিয়াছে—কিন্তু ভারতবর্ষে লোকবাৎসল্য জন্মিয়াছে কি?

গুরু। আজি কালির কথা ছাড়িয়া দাও। আজি কালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর বড় বেশী হইয়াছে বলিয়া আমরা দেশবৎসল হইতেছি, লোকবৎসল আর নহি। এখন ভিন্ন জাতির উপর আমাদেরও বিদ্বেষ জন্মিতেছে। কিন্তু এত কাল তাহা ছিল না; দেশবাৎসল্য জিনিসটা দেশে ছিল না। কথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতির প্রতি ভিন্ন ভাব ছিল না। হিন্দু রাজা ছিল, তার পর মুসলমান হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না, হিন্দুর কাছে হিন্দু মুসলমান সমান। মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দুপ্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহি, ইংরেজের হইয়া লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেন না, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইংরেজের অধীন ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভুভক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে হিন্দু দুর্ব্বল বলিয়া কৃত্রিম প্রভুভক্ত।

শিষ্য। তা, সাধারণ হিন্দু প্রজা বা ইংরেজের সিপাহিরা যে বুঝিয়াছিল ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, সকলই আমি, এ কথা ত বিশ্বাস হয় না।

গুরু। তাহা বুঝে নাই। কিন্তু জাতীয় ধর্ম্মে জাতীয় চরিত্র গঠিত। যে জাতীয় ধর্ম্ম বুঝে না সেও জাতীয় ধর্ম্মের অধীন হয়, জাতীয় ধর্ম্মে তাহার চরিত্র শাসিত হয়। ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে। যে কয়জন বুঝে তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত্র শাসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলন ধর্ম্ম যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশী ভরসা আমি এখন রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে মনস্বীগণ কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হইলে, ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে। জাতীয় ধর্ম্মের মুখ্যফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণফল সকলেই পাইতে পারে।

শিষ্য। তার পর আর একটা কথা আছে। আপনি যে প্রীতির পারমার্থিক অনুশীলনপদ্ধতি বুঝাইলেন তাহার ফল, লোক-বাৎসল্যে দেশ-বাৎসল্য ভাসিয়া যায়। কিন্তু দেশ-বাৎসল্যের অভাবে ভারতবর্ষ সাত শত বৎসর পরাধীন হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পারমার্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে?

গুরু। সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারাই হইবে। যাহা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাহা নিষ্কাম হইয়া করিবে। যে কর্ম্ম ঈশ্বরানুমোদিত তাহাই অনুষ্ঠেয়। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পরপীড়িতের রক্ষা, অনুন্নতের উন্নতিসাধন—সকলই ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম, সুতরাং অনুষ্ঠেয়। অতএব নিষ্কাম হইয়া আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পীড়িত দেশীয়বর্গের রক্ষা, দেশীয় লোকের উন্নতি সাধন করিবে।

শিষ্য। নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আত্মরক্ষাই ত সকাম।

গুরু। সে কথার উত্তর কাল দিব।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।—আত্মপ্রীতি।

শিষ্য। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আপনি বলিয়াছিলেন, “কাল উত্তর দিব।” সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছা করি।

গুরু। আমার এই ভক্তিবাদ সমর্থনার্থ কোন জড়বাদীর সহায়তা গ্রহণ করিব, তুমি এমন প্রত্যাশা কর না। তথাপি হর্বর্ট স্পেন্সরের একটি কথা তোমাকে পড়াইয়া শুনাইব।

"A creature must live before it can act. From this it is a corollary that the acts by which each maintains his own life must, *speaking generally*, precede in imperativeness all other acts of which he is capable. For if it be asserted that these other acts must precede in imperativeness the acts which maintain life; and if this, accepted as a general law of conduct, is conformed to by all; then by postponing the acts which maintain life to the other acts which life makes possible, all must lose their lives.....The acts required for continued self-preservation, including the enjoyment of benefits achieved by such acts, are the first requisites to universal welfare. Unless each *duly* cares for himself, his care for all others is ended by death; and if each thus dies, there remain no others to be cared for."*

অতএব, জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া, ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, এজন্য আত্ম-রক্ষাকেও নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে, ও করাই কর্ত্তব্য।

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার তুলনা করিয়া দেখ। পরহিত ধর্ম্মাপেক্ষা আত্মরক্ষা ধর্ম্মের গৌরব অধিক। যদি জগতে লোকে পরস্পরের হিত না করে, পরস্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগৎ মনুষ্যশূন্য হইবে না। অসভ্য সমাজ সকল ইহার উদাহরণ। কিন্তু সকলে আত্মরক্ষায় বিরত হইলে, সভ্য কি অসভ্য কোন সমাজ, কোন প্রকার মনুষ্য বা জীব জগতে থাকিবে না। অতএব, পরহিতের আগে আপনার প্রাণরক্ষা।

শিষ্য। এ সকল অতি অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মনে করুন, পরকে না দিয়া আপনি খাইব ?

গুরু। তুমি যাহা কিছু আহার্য্য সংগ্রহ কর, তাহা যদি সমস্তই প্রত্যহ অন্যকে বিলাইয়া দাও, তবে পাঁচ-সাত দিনে তোমার দানধর্ম্মের শেষ হইবে। কেন না, তুমি নিজে না খাইয়া মরিয়া যাইবে। পরকে দিবে, কিন্তু পরকে দিয়া আপনি খাইবে। যদি পরকে দিতে না কুলায় তবে কাজেই পরকে না দিয়া আপনিই খাইবে। এই "না কুলায়" কথাটাই যত অধর্ম্মের গোড়া। যাঁর নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ তিনটা পাঁঠা দেড় কুড়ি মাছের

* *Data of Ethics*, Chap. XI. [p. 187.]। Italic যে যে শব্দে দেওয়া হইল, তাহা আমার দেওয়া।

প্রাণ সংহার হয়, তাঁর কাজেই পরকে দিতে কুলায় না। যে সর্ব্বভূতে সমান দেখে, আপনাতে ও পরে সমান দেখে, সে পরকে যেমন দিতে পারে আপনি তেমনই খায়। ইহাই ধর্ম্ম—আপনি উপবাস করিয়া পরকে দেওয়া ধর্ম্ম নহে। কেন না, আপনাতে ও পরে সমান করিতে হইবে।

শিষ্য। ভাল, আমার প্রযুক্ত উদাহরণটা, না হয়, অনুপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কখন কি পরোপকারার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে?

গুরু। অনেক সময়ে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। না করাই অধর্ম্ম।

শিষ্য। তাহার দুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। যে মাতা পিতার নিকট তুমি প্রাণ পাইয়াছ, যাঁহাদিগের যত্নে তুমি কর্ম্মক্ষম ও ধর্ম্মক্ষম হইয়াছ, তাঁহাদিগের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জনই ধর্ম্ম, না করা অধর্ম্ম।

সেইরূপ প্রাণদানাদি উপকার যদি তুমি অন্যের কাছে পাইয়া থাক, তবে তাহার জন্যও ঐরূপ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনীয়।

যাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ ঐরূপে বিসর্জ্জনীয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক কাহার। তুমি রক্ষক, (১) স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের, (২) স্বদেশের, (৩) প্রভুর, অর্থাৎ যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার; (৪) শরণাগতের। অতএব স্ত্রীপুত্রাদি, স্বদেশ, প্রভু, এবং শরণাগত, এই সকলের রক্ষার্থ আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করা ধর্ম্ম।

যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুষ্যমাত্রেই তাহাদের রক্ষক। স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ পীড়িত, অন্ধ খঞ্জাদি অঙ্গহীন, ইহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম। ইহাদের রক্ষার্থ প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম্ম।

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগুলি গণনা করিয়া উঠা যায় না। প্রয়োজনও নাই। যাহার জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলিত ও সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকল অবস্থাতেই বুঝিতে পারিবে যে, এই স্থলে প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম্ম, এই স্থলে অধর্ম্ম।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য্য এই বুঝিলাম যে, আত্মপ্রীতি প্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইলেও, ঘৃণার যোগ্য নহে। উপযুক্ত নিয়মে উহার সীমা বদ্ধ করিয়া, উহারও সম্যক্ অনুশীলন কর্ত্তব্য। বটে?

গুরু। বস্তুতঃ যদি আত্ম-পর সমান হইল, তবে আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি, ভিন্ন বিবেচনা করাও উচিত নহে। উপযুক্তরূপে উভয়ে অনুশীলিত ও সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইলে আত্ম-প্রীতি জাগতিক প্রীতির অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। কেন না, আমি ত জগতের বাহিরে নই। ধর্ম্মের, বিশেষত হিন্দুধর্ম্মের, মূল একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন ; এজন্য সর্ব্বভূতের হিতসাধন আমাদের ধর্ম্ম, কেন না, বলিয়াছি যে সকল বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করাই মনুষ্যজন্মের চরম উদ্দেশ্য। যদি সর্ব্বভূতের হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে পরেরও হিতসাধন যেমন আমার ধর্ম্ম, তেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধর্ম্ম। কারণ আমিও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত ; ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষাদি আমার ধর্ম্ম এবং আপনারও রক্ষাদি আমার ধর্ম্ম। আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি এক।

শিষ্য। কিন্তু কথাটার গোলযোগ এই যে, যখন আত্মহিত এবং পরহিত পরস্পর বিরোধী, তখন আপনার হিত করিব, না পরের হিত করিব ? পূর্ব্বগামী ধর্ম্মবেত্তৃগণের মত এই যে, আত্মহিতে ও পরহিতে পরস্পর বিরোধ হইলে, পরহিত সাধনই ধর্ম্ম।

গুরু। ঠিক এমন কথাটা কোন ধর্ম্মে আছে, তাহা আমি বুঝি না। খৃষ্টধর্ম্মের উক্তি যে, পরের "তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার তুমি বাসনা কর, তুমি পরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে।" এ উক্তিতে পরহিতকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না, পরহিত ও আত্মহিতকে তুল্য করা হইতেছে। কিন্তু সে কথা থাক্, কেন না, আমাকেও এই অনুশীলনতত্ত্বে পরহিতকেই স্থলবিশেষে প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু তুমি যে কথা তুলিলে, তাহারও সুমীমাংসা আছে। সেই মীমাংসার প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই যে, পরের অনিষ্টমাত্রই অধর্ম্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ইহা হিন্দুধর্ম্মেও বলে, খৃষ্ট বৌদ্ধাদি অপর ধর্ম্মেরও এই মত, এবং আধুনিক দার্শনিক বা নীতিবেত্তাদিগেরও মত। অনুশীলনতত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ, পরের অনিষ্ট, ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের বিরোধী ও বিঘ্নকর এবং যে সাম্যজ্ঞান ভক্তি ও প্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। পরের অনিষ্ট, ভক্তি প্রীতি দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, এজন্য যেখানে পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্দ্বারা আপনার হিতসাধন করিবে না, ইহা অনুশীলনধর্ম্মের এবং হিন্দুধর্ম্মের আজ্ঞা। আত্মপ্রীতি-তত্ত্বের ইহাই প্রথম নিয়ম।

শিষ্য। নিয়মটা কি প্রকারে খাটে—দেখা যাউক। এক ব্যক্তি চোর, সে সপরিবারে খাইতে পায় না, উপবাস করিয়া আছে। এরূপ যে চোরের সর্ব্বদা ঘটে, তাহা

বলা বাহুল্য। যে, রাত্রে আমার ঘরে সিঁধ দিয়াছে—অভিপ্রায় কিছু চুরি করিয়া আপনার ও পরিবারবর্গের আহার সংগ্রহ করে। তাহাকে আমি ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিব, না উপহারস্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিব?

গুরু। তাহাকে ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিবে।

শিষ্য। তাহা হইলে আমার সম্পত্তিরক্ষা-রূপ ইষ্টসাধন হইল বটে, কিন্তু চোরের এবং তাহার নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল। আপনার সূত্রটি খাটে?

গুরু। চোরের নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রাদি যদি অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থ কিছু দান করিতে পার। চোরও যদি না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দিতে পার। কিন্তু চুরির দণ্ড দিতে হইবে। কেন না, না দিলে, কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, সমস্ত লোকের অনিষ্ট। চোরের প্রশ্রয়ে চৌর্য্যবৃদ্ধি, চৌর্য্যবৃদ্ধিতে সমাজের অনিষ্ট।

শিষ্য। এ ত বিলাতী হিতবাদীর কথা—আপনার মতে "Greatest good of the greatest number" এখানে অবলম্বনীয়।

গুরু। হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বটা এই হিতবাদ মতের ভিতরই আছে। তাহা না হইয়া, ইহা ধর্ম্মতত্ত্বের সামান্য অংশ মাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র। তত্ত্বটা সত্যমূলক, কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম্ম ভক্তিতে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নির্ঝরিণী নামিয়াছে—হিতবাদ ইহা তাহার একটি ক্ষুদ্রতম স্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক—ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধর্ম্ম—অধর্ম্ম নহে।

স্থূল কথা, অনুশীলন ধর্ম্মে "Greatest good of the greatest number," গণিততত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে এক জনের হিতসাধন ধর্ম্ম, আবার এক জনের হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশ গুণ ধর্ম্ম। যদি এক দিকে এক জনের হিতসাধন, ও আর এক দিকে দশ জনের তুল্য হিতসাধন পরস্পরবিরুদ্ধ কর্ম্ম হয়, তবে এক জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশ জনের তুল্য হিতসাধনই ধর্ম্ম; এবং দশ জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া এক জনের তুল্য হিতসাধন করা অধর্ম্ম।* এখানে "Good of the greatest number."

* ভরসা করি, কেহই ইহার এমন অর্থ বুঝিবেন না যে, দশ জনের হিতের জন্য এক জনের অনিষ্ট করিবে। তাহা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ইহা বলা বাহুল্য।

পক্ষান্তরে, এক জনের অল্প হিত, আর এক দিকে আর এক জনের বেশী হিত পরস্পর বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিতসাধন করাই ধর্ম্ম, তদ্বিপরীতই অধর্ম্ম। এখানে কথাটা "Greatest good."

শিষ্য। সে ত স্পষ্ট কথা।

গুরু। যত স্পষ্ট এখন বোধ হইতেছে, কার্য্যকালে তত স্পষ্ট হয় না। এক দিকে শ্যামু ঠাকুর, কুলীন ব্রাহ্মণ, কন্যাভারগ্রস্ত, অর্থাভাবে মেয়েটি স্বঘরে দিতে পারিতেছেন না; আর এক দিকে রামা ডোম, কতকগুলি অপোগণ্ডভারগ্রস্ত, সপরিবারে খাইতে পায় না, প্রাণ যায়। এখানে "Greatest good" রামার দিকে, কিন্তু উভয়েই তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতে আসিলে, তুমি বোধ করি শ্যামু ঠাকুরকে পাঁচটি টাকা দিয়াও কুণ্ঠিত হইবে, মনে করিবে কম হইল, আর রামাকে চারিটা পয়সা দিতে পারিলেই আপনারে দাতা ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করিবে। অন্ততঃ অনেক বাঙ্গালিই এইরূপ। বাঙ্গালি কেন, সকল জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইরূপ সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। সে কথা যাক। সর্ব্বভূত যদি সমান, তবে অল্পের অপেক্ষা বেশী লোকের হিতসাধন ধর্ম্ম, এবং এক জনের অল্প হিতের অপেক্ষায় এক জনের বেশী হিতসাধন ধর্ম্ম। কিন্তু যেখানে এক জনের বেশী হিত এক দিকে, আর দশ জনের অল্প হিত (তুল্য হিত নহে) আর এক দিকে, সেখানে ধর্ম্ম কি ?

গুরু। সেখানে অঙ্ক কষিবে। মনে কর এক দিকে এক জনের যে পরিমাণে হিত সাধিত হইতে পারে, অন্য দিকে শত জনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে পারে। এ স্থলে এই শত জনের হিতের অঙ্ক $\frac{১০০}{৪}$ = ২৫। এখানে এক জনের বেশী হিত পরিত্যাগ করিয়া শত জনের অল্প হিতসাধন করাই ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে, যদি এই শত জনের প্রত্যেকের হিতের মাত্রা চতুর্থাংশ না হইয়া, সহস্রাংশ হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের সুখের মাত্রার সমষ্টি এক জনের $\frac{১}{১০}$ মাত্র। সুতরাং এ স্থলে সে শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিয়া এক ব্যক্তির হিতসাধন করাই ধর্ম্ম।

শিষ্য। হিতের কি এরূপ ওজন হয় ? মাপকাটিতে মাপ হয়, এত গজ এত ইঞ্চি ?

গুরু। ইহার সদুত্তর কেবল অনুশীলনবাদীই দিতে পারেন। যাঁহার সকল বৃত্তি, বিশেষ জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি সম্যক্ অনুশীলিত ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, হিতাহিত মাত্রা ঠিক বুঝিতে তিনি সক্ষম। যাঁহার সেরূপ অনুশীলন হয় নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা অনেক সময়ে

দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মই দুঃসাধ্য, ইহা বোধ করি বুঝাইয়াছি। তথাপি ইহা দেখিবে যে, সচরাচর মনুষ্য অনেক স্থানেই এরূপ কার্য্য করিতে পারে। ইউরোপীয় হিতবাদীরা ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, সুতরাং আমার আর সে সকল কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ যে, অনুশীলনতত্ত্বে হিতবাদের স্থান কোথায় ?

শিষ্য। স্থান কোথায় ?

গুরু। প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যে। সর্ব্বভূত সমান, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের হিত পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, সেস্থলে ওজন করিয়া, বা অঙ্ক কষিয়া দেখিবে। অর্থাৎ "greatest good of the greatest number" আমি যে অর্থে বুঝাইলাম, তাহাই অবলম্বন করিবে। যখন পরহিতে পরহিতে এইরূপ বিরোধ, তখন কি প্রকারে এই বিচার কর্ত্তব্য, তাহাই বুঝাইয়াছি। কিন্তু পরহিতে পরহিতে বিরোধের অপেক্ষা, আত্মহিতে পরহিতে বিবাদ আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার। সেখানেও সামঞ্জস্যের সেই নিয়ম। অর্থাৎ—

(১) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিকে একাধিক সংখ্যক লোকের তুল্য হিত, সেখানে আত্মহিত ত্যাজ্য, এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয়।

(২) যেখানে এক দিকে আত্মহিত, অন্য দিকে অপর এক জনের অধিক হিত, সেখানেও পরের হিত অনুষ্ঠেয়।

(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত এক দিকে, অন্যের অল্প হিত এক দিকে, সেখানে কোন্ দিকের মোট মাত্রা বেশী তাহা দেখিবে। তোমার দিক বেশী হয়, আপনার হিত সাধিত করিবে ; পরের দিক বেশী হয়, পরের হিত খুঁজিবে।

শিষ্য। (৪) আর যেখানে দুইখানে দুই দিক সমান ?

গুরু। সেখানে পরের হিত অনুষ্ঠেয়।

শিষ্য। কেন ? সর্ব্বভূত যখন সমান, তখন আপনি পর ত সমান।

গুরু। অনুশীলনতত্ত্বে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিনী। কেবল আত্মানুরাগিনী প্রীতি প্রীতি নহে। আপনার হিতসাধনে প্রীতির অনুশীলন, স্ফুরণ বা চরিতার্থতা হয় না। পরহিত সাধনে তাহা হইবে। এই জন্য এ স্থলে পরপক্ষ অবলম্বনীয়। কেন না তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন ও চরিতার্থতা জন্য

তোমার যে নিজের হিত, তাহাও সাধিত হয়। অতএব মোটের উপর পরপক্ষে বেশী হিত সাধিত হয়।

অতএব, আত্মপ্রীতির সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আমি যে প্রথম নিয়ম বলিয়াছি, অর্থাৎ যেখানে পরের অনিষ্ট হয়, সেখানে আত্মহিত পরিত্যাজ্য, তাহার সম্প্রসারণ ও সীমাবন্ধন স্বরূপ হিতবাদীদিগের এই নিয়ম দ্বিতীয় নিয়মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পার।

আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে। অনেক সময় আমার আত্মহিত যত দূর আমার আয়ত্ত, পরের হিত তাদৃশ নহে। উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমরা যত সহজে আপনার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারি, পরের তত সহজে পারি না। এ স্থলে অগ্রে আপনার মানসিক উন্নতির সাধনই কর্ত্তব্য, কেন না সিদ্ধির সম্ভাবনা বেশী। পুনশ্চ, অনেক স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে পরের হিত সাধিত করিতে পারা যায় না। এ স্থলেও পরপক্ষ অপেক্ষা আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার মানসিক উন্নতি না হইলে, আমি তোমার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারিব না; অতএব এখানে আগে আপনার হিত অবলম্বনীয়। যদি তোমাকে আমাকে এককালে শত্রুতে আক্রমণ করে, তবে আগে আপনার রক্ষা না করিলে, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। চিকিৎসক নিজে রুগ্নশয্যাশায়ী হইলে, আগে আপনার আরোগ্যসাধন না করিলে, পরকে আরোগ্য দিতে পারেন না। এ সকল স্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয়।

এক্ষণে, তোমাকে যাহা বুঝাইয়াছিলাম, তাহা আবার স্মরণ কর।

প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই যথার্থ প্রীতির অনুশীলন।

দ্বিতীয়, তদ্দ্বারা আত্মপ্রীতির সমুচিত ও সীমাবদ্ধ অনুশীলন নিষিদ্ধ হইতেছে না, কেন না, আমিও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত।

তৃতীয়, বৃত্তির অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্য—সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। অতএব যাহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, তাহাই অনুষ্ঠেয়। ঈদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অনুবর্ত্তনে কখন অবস্থা বিশেষে আত্মহিত, কখন অবস্থা বিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয়।

তাহাতে হিন্দুধর্ম্মোক্ত সাম্যজ্ঞানের বিঘ্ন হয় না। তুমি যেখানে আত্মরক্ষার অধিকারী, পরেও সেইখানে সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী। যেখানে তুমি পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার জন্য আত্মবিসর্জ্জনে বাধ্য। এই জ্ঞানই সাম্যজ্ঞান। অতএব আমি যে সকল বর্জ্জিত কথা বলিলাম, তদ্দ্বারা গীতোক্ত সাম্যজ্ঞানের কোন হানি হইতেছে না।

শিষ্য। কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কোন সমুচিত উত্তর হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হিন্দুর পারমার্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে।

গুরু। উত্তরের প্রথম সূত্র সংস্থাপিত হইল। এক্ষণে ক্রমশঃ উত্তর দিতেছি।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।—স্বজনপ্রীতি।

গুরু। এক্ষণে হর্বর্ট স্পেন্সরের যে উক্তি তোমাকে শুনাইয়াছি তাহা স্মরণ কর।

"Unless each duly cares for himself, his care for all others is ended by death ; and if each thus dies, there remain no others to be cared for."

জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে আত্মরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, কেন না তদ্ব্যতীত সৃষ্টিরক্ষা হয় না। কিন্তু একথা কেবল আত্মরক্ষা সম্বন্ধেই যে খাটে এমন নহে। যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, এবং যাহাদের রক্ষার ভার তোমার উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ন্যায় জগৎরক্ষার পক্ষে তাদৃশ প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। আপনি সন্তানাদির কথা বলিতেছেন ?

গুরু। প্রথমে অপত্যপ্রীতির কথাই বলিতেছি। বালকেরা আপনাদিগের পালনে ও রক্ষণে সক্ষম নহে। অন্যে যদি তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন না করে, তবে তাহারা বাঁচে না। যদি সমস্ত শিশু অপালিত ও অরক্ষিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তবে জগৎও জীবশূন্য হইবে। অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধর্ম্ম, সন্তানাদির পালনও তাদৃশ গুরুতর ধর্ম্ম। আত্মরক্ষার ন্যায়, ইহাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, সুতরাং ইহাকেও নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে। বরং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও সন্তানাদির পালন ও রক্ষণ গুরুতর ধর্ম্ম ; কেন না যদি সমস্ত জগৎ আত্মরক্ষায় বিরত হইয়াও সন্তানাদি রক্ষায় নিযুক্ত ও সফল হইয়া সন্তানাদি রাখিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সৃষ্টি রক্ষিত হয়, কিন্তু সমস্ত জীব সন্তানাদির রক্ষায় বিরত হইয়া কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে, সন্তানাদির অভাবে জীবসৃষ্টি বিলুপ্ত হইবে। অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা সন্তানাদির রক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।

ইহা হইতে একটি গুরুতর তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। অপত্যাদির রক্ষার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করা ধর্ম্মসঙ্গত। পূর্ব্বে যে কথা আন্দাজি বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রমাণীকৃত হইল।

ইহা পশু পক্ষীতেও করিয়া থাকে। ধর্ম্মজ্ঞানবশতঃ তাহারা এরূপ করে, এমন বলা যায় না। অপত্যপ্রীতি স্বাভাবিক বৃত্তি, এই জন্য ইহা করিয়া থাকে। অপত্যস্নেহ যদি স্বতন্ত্র স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, তবে তাহা সাধারণ প্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময়ে হইয়াও থাকে। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, অনেকে অপত্যস্নেহের বশীভূত হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতির বিরোধ সম্ভাবনার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, জাগতিক প্রীতির সঙ্গে অপত্যপ্রীতিরও সেইরূপ বিরোধের শঙ্কা করিতে হয়।

কেবল তাহাই নহে। এখানে যে আত্মপ্রীতি আসিয়া যোগ দেয় না, এমন কথা বলা যায় না। ছেলে আমার, সুতরাং পরের কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দিতে হইবে। ছেলের উপকারে, আমার উপকার, অতএব যে উপায়ে হউক, ছেলের উপকার সিদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া অনেকে কার্য্য করিয়া থাকেন।

অতএব এই অপত্যপ্রীতির সামঞ্জস্যজন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

শিষ্য। এই সামঞ্জস্যের উপায় কি ?

গুরু। উপায়—হিন্দুধর্ম্মের ও প্রীতিতত্ত্বের সেই মূলসূত্র—সর্ব্বভূতে সমদর্শন। অপত্যপ্রীতি সেই জাগতিক প্রীতিতে নিমজ্জিত করিয়া, অপত্যপালন ও রক্ষণ ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ; সুতরাং অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম জানিয়া, "জগদীশ্বরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছি, আমার ইহাতে ইষ্টানিষ্ট কিছু নাই," ইহা মনে বুঝিয়া, সেই অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিবে। তাহা হইলে এই অপত্যপালন ও রক্ষণধর্ম্ম নিষ্কামধর্ম্মে পরিণত হইবে। তাহা হইলে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মেরও অতিশয় সুনির্ব্বাহ হইবে ; অথচ তুমি নিজে এক দিকে শোকমোহাদি, আর এক দিকে পাপ ও দুর্ব্বাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

শিষ্য। আপনি কি অপত্যস্নেহ-বৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে জাগতিক প্রীতির সমাবেশ করিতে বলেন ?

গুরু। আমি কোন বৃত্তিরই উচ্ছেদ করিতে বলি না ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। তবে, পাশববৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। পাশববৃত্তি সকল স্বতঃস্ফূর্ত্ত। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার দমনই অনুশীলন। অপত্যস্নেহ, পরম রমণীয় ও পবিত্র বৃত্তি।

পাশববৃত্তিগুলির সঙ্গে ইহার এই ঐক্য আছে যে, ইহা যেমন মনুষ্যের আছে, তেমনি পশুদিগেরও আছে। তাদৃশ সকল বৃত্তিই স্বতঃস্ফূর্ত্ত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অপত্যস্নেহও সেই জন্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত। বরং সমস্ত মানসিক বৃত্তির অপেক্ষা ইহার বল দুর্দ্দমনীয় বলা যাইতে পারে। এখন অপত্যপ্রীতি যতই রমণীয় ও পবিত্র হউক না কেন, উহার অনুচিত স্ফূর্ত্তি অসামঞ্জস্যের কারণ, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার সংযম না করিলে অনুচিত স্ফূর্ত্তি ঘটিয়া উঠে। এই জন্য উহার সংযম আবশ্যক। উহার সংযম না করিলে, জাগতিক প্রীতি ও ঈশ্বরে ভক্তি, উহার স্রোতে ভাসিয়া যায়। আমি বলিয়াছি ঈশ্বরে ভক্তি, ও মনুষ্যে প্রীতি, ইহাই ধর্ম্মের সার, অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুখের মূলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম। অতএব অপত্যপ্রীতির অনুচিত স্ফূরণে এইরূপ ধর্ম্মনাশ, সুখনাশ, এবং মনুষ্যত্বনাশ ঘটিতে পারে। লোকে ইহার অন্যায় বশীভূত হইয়া ঈশ্বর ভুলিয়া যায়; ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া, অপত্য ভিন্ন আর সকল মনুষ্যকে ভুলিয়া যায়। আপনার অপত্য ভিন্ন আর কাহারও জন্য কিছু করিতে চাহে না। ইহাই অন্যায় স্ফূর্ত্তি। পক্ষান্তরে, অবস্থা বিশেষে ইহার দমন না করিয়া ইহার উদ্দীপনই বিধেয় হয়। অন্যান্য পাশববৃত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই যে, ইহা কামাদি নীচবৃত্তির ন্যায় সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। এমন নরপিশাচ ও পিশাচীও দেখা যায় যে, তাহাদের এই পরম রমণীয়, পবিত্র এবং সুখকর স্বাভাবিক বৃত্তি অন্তর্হিত। অনেক সময়ে সামাজিক পাপবাহুল্যে এই সকল বৃত্তির বিলোপ ঘটে। ধনলোভে পিশাচ পিশাচীরা পুত্রকন্যা বিক্রয় করে; লোকলজ্জা ভয়ে কুলকলঙ্কিনীরা তাহাদের বিনাশ করে; কুলকলঙ্ক ভয়ে কুলাভিমানীরা কন্যাসন্তান বিনাশ করে; অনেক কামুকী কামাতুর হইয়া সন্তান পরিত্যাগ করিয়া যায়। অতএব এই বৃত্তির অভাব বা লোপও অতি ভয়ঙ্কর অধর্ম্মের কারণ। যেখানে ইহা উপযুক্তরূপে স্বতঃস্ফূর্ত্ত না হয়, সেখানে অনুশীলন দ্বারা ইহাকে স্ফুরিত করা আবশ্যক। উপযুক্ত মত স্ফুরিত ও চরিতার্থ হইলে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কোন বৃত্তিই ঈদৃশ সুখদ হয় না। সুখকারিতায় অপত্যপ্রীতি ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন সকল বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ।

অপত্যপ্রীতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দম্পতীপ্রীতি সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। অর্থাৎ (১) স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর। স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও প্রতিপালনে অক্ষম। অতএব তাহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা। এজন্য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও ধর্ম্মসঙ্গত।

(২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্তু তাঁহার সেবা, ও সুখসাধন তাঁহার সাধ্য। তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম। অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ; হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়াছে। যদি দম্পতীপ্রীতিকে পাশববৃত্তিতে পরিণত না করা হয়, তবে ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম; তিনি স্বামীর ধর্ম্মের সহায়। অতএব স্বামীর সেবা, সুখসাধন ও ধর্ম্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম্ম।

(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধর্ম্মাচরণের জন্য দম্পতীপ্রীতি। তাহা স্মরণ রাখিয়া এই প্রীতির অনুশীলন করিলে ইহাও নিষ্কামধর্ম্মে পরিণত হইতে পারে ও হওয়াই উচিত। নহিলে ইহা নিষ্কামধর্ম্ম নহে।

শিষ্য। আমি এই দম্পতীপ্রীতিকেই পাশববৃত্তি বলি, অপত্যপ্রীতিকে পাশববৃত্তি বলিতে তত সম্মত নহি। কেন না, পশুদিগেরও দাম্পত্য অনুরাগ আছে। সে অনুরাগও অতিশয় তীব্র।

গুরু। পশুদিগের দম্পতীপ্রীতি নাই।

শিষ্য।——

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি
গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥

গুরু। ওহো! কিন্তু আসল কথাটা ছাড়িয়া গেলে যে!

তং দেশমারোপিত পুষ্পচাপে
রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে—ইত্যাদি।

রতি সহিত মন্মথ সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাশব অনুরাগের বিকাশ। কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, এই অনুরাগ স্মরজ। ইহা পশুদিগেরও আছে, মনুষ্যেরও আছে। ইহাকে কামবৃত্তি বলিয়া পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। ইহাকে দম্পতীপ্রীতি বলি না। ইহা পাশববৃত্তি বটে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, এবং ইহার দমনই অনুশীলন। কাম, সহজ; দম্পতীপ্রীতি সংসর্গজ; কামজনিত অনুরাগ ক্ষণিক, দম্পতীপ্রীতি স্থায়ী। তবে ইহা স্বীকার করিতে

হয় যে, অনেক সময়ে এই কামবৃত্তি আসিয়া দম্পতিপ্রীতিস্থান অধিকার করে। অনেক সময়ে তাহার স্থান অধিকার না করুক, দম্পতিপ্রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায়, যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, বাসনার প্রবলতা, সেই পরিমাণে দম্পতিপ্রীতিও পাশবতা প্রাপ্ত হয়। এই সকল অবস্থায় দম্পতিপ্রীতি অতিশয় বলবতী বৃত্তি হইয়া উঠে। এ সকল অবস্থায় তাহার সামঞ্জস্য আবশ্যক। যে সকল নিয়ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাই সামঞ্জস্যের উত্তম উপায়।

শিষ্য। আমি যত দূর বুঝিতে পারি, এই কামবৃত্তিই সৃষ্টিরক্ষার উপায়। দম্পতি-প্রীতি ব্যতীত ইহার দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে। ইহাই তবে নিষ্কাম ধর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে। দম্পতিপ্রীতি যে নিষ্কাম ধর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে, এমন বিচারপ্রণালী দেখিতেছি না।

গুরু। স্মরজ বৃত্তিও যে নিষ্কাম কর্ম্মের কারণ হইতে পারে, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তোমার আসল কথাতেই ভুল। দম্পতিপ্রীতি ব্যতীত কেবল পাশব বৃত্তিতে জগৎ রক্ষা হইতে পারে না।

শিষ্য। পশুসৃষ্টি ত কেবল তদ্দারাই রক্ষিত হইয়া থাকে?

গুরু। পশুসৃষ্টি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যসৃষ্টি রক্ষা পাইতে পারে না। কারণ পশুদিগের স্ত্রীদিগের আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শক্তি আছে। মনুষ্যস্ত্রীর তাহা নাই। অতএব মনুষ্যজাতি মধ্যে পুরুষ দ্বারা স্ত্রীজাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে স্ত্রীজাতির বিলোপের সম্ভাবনা।

শিষ্য। মনুষ্যজাতির অসভ্যাবস্থায় কিরূপ?

গুরু। যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মনুষ্য পশুতুল্য, অর্থাৎ বিবাহপ্রথা নাই, সেই অবস্থায় স্ত্রীলোক সকল আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনে সক্ষম কি না, তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই। কেন না, তাদৃশ অসভ্যাবস্থার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্য যত দিন সমাজভুক্ত না হয়, তত দিন তাহাদের শারীরিক ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম নাই বলিলেও হয়। ধর্ম্মাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই; জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান সম্ভবে না। ধর্ম্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভবে না; এবং যেখানে অন্য মনুষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানে মনুষ্যে প্রীতি প্রভৃতি ধর্ম্মও সম্ভবে না। অর্থাৎ অসভ্যাবস্থায় শারীরিক ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম সম্ভব নহে।

ধর্ম্মজন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহপ্রথা। বিবাহপ্রথার স্থূল মর্ম্ম এই যে স্ত্রীপুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্ব্বাহ করিবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ—পালন ও রক্ষণ। স্ত্রী অন্যভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত। বহুপুরুষপরম্পরায় এইরূপ বিরক্তি ও অনভ্যাস বশতঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম। এ অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ্য স্ত্রীজাতির বিলোপ ঘটিবে। অথচ যদি পুনশ্চ তাহাদিগের সে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহপ্রথার বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্ম্ম বিনষ্ট না হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও বলিতে হইবে।

শিষ্য। তবে পাশ্চাত্যেরা যে স্ত্রীপুরুষের সাম্যস্থাপন করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র ?

গুরু। সাম্য কি সম্ভবে ? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্য পান করাইতে পারে ? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্‌টন লইয়া লড়াই চলে কি ?

শিষ্য। তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথা যে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না ?

গুরু। কেন খাটিবে না ? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অনুশীলন করিবে। স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, তাহা অনুশীলিত করুক ; পুরুষের স্তন্যপান করাইবার শক্তি থাকে, অনুশীলিত করুক।

শিষ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকেরা ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি পৌরুষ কর্ম্মে বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়া থাকে।

গুরু। অভ্যাসে ও অনুশীলনে যে প্রভেদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। অনুশীলন, শক্তির অনুকূল ; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনে শক্তির বিকাশ ; অভ্যাসে বিকার। এ সকল অভ্যাসের ফল, অনুশীলনের নহে। অভ্যাস, প্রয়োজন মতে কর্ত্তব্য, অনুশীলন সর্ব্বত্র কর্ত্তব্য।

যাক। এ তত্ত্ব যেটুকু বলা আবশ্যক তাহা বলা গেল। এখন অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সম্বন্ধে কয়টা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা পুনরুক্ত করিয়া সমাপ্ত করি।

প্রথম, বলিয়াছি যে অপত্যপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। দম্পতিপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিলালসা ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহাও স্বতঃস্ফূর্ত্তের ন্যায় বলবতী

হয়। এই উভয় বৃত্তিই এই সকল কারণে অতি দুর্দ্দমনীয় বেগবিশিষ্ট। অপত্যপ্রীতির ন্যায় দুর্দ্দমনীয় বেগবিশিষ্ট বৃত্তি মনুষ্যের আর আছে কি না সন্দেহ। নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দ্বিতীয়, এই দুইটি বৃত্তিই অতিশয় রমণীয়। ইহাদের তুল্য বল আর কোন বৃত্তির থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু এমন পরম রমণীয় বৃত্তি মনুষ্যের আর নাই। রমণীয়তায়, এই দুইটি বৃত্তি সমস্ত মনুষ্যবৃত্তিকে এত দূর পরাভব করিয়াছে যে, এই দুইটি বৃত্তি, বিশেষতঃ দম্পতিপ্রীতি, সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যায়।

তৃতীয়তঃ, সাধারণ মনুষ্যেব পক্ষে সুখকর ও এই দুই বৃত্তির তুল্যও আর নাই। ভক্তি ও জাগতিকপ্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহা অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় না; সে অনুশীলনও কঠিন ও জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু অপত্যপ্রীতির সুখ অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, এবং দম্পতিপ্রীতির সুখ কিয়ৎপরিমাণে অনুশীলনসাপেক্ষ হইলেও সে অনুশীলন, অতি সহজ ও সুখকর।

এই সকল কারণে, এই দুই বৃত্তি অনেক সময়ে মনুষ্যের ঘোরতর ধর্ম্মবিঘ্নে পরিণত হয়। ইহারা পরম রমণীয় এবং অতিশয় সুখদ, এজন্য ইহাদের অপরিমিত অনুশীলনে মনুষ্যের অতিশয় প্রবৃত্তি। এবং ইহার বেগ দুর্দ্দমনীয়, এজন্য ইহার অনুশীলনের ফল, ইহাদের সর্ব্বগ্রাসিনী বৃদ্ধি। তখন ভক্তি প্রীতি এবং সমস্ত ধর্ম্ম ইহাদের বেগে ভাসিয়া যায়। এই জন্য সচরাচর দেখা যায় যে, মনুষ্য স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহের বশীভূত হইয়া অন্য সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। বাঙ্গালির এ কলঙ্ক বিশেষ বলবান্।

এই কারণে যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদিগের নিকট অপত্যপ্রীতি ও দম্পতি-প্রীতি অতিশয় ঘৃণিত। তাঁহারা স্ত্রীমাত্রকেই, পিশাচী মনে করেন। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি, অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সঙ্কুচিত মাত্রায়, পরম ধর্ম্ম। তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম। অতএব সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না। আর জাগতিক-প্রীতি-তত্ত্ব বুঝাইবার সময় তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, এই পারিবারিকপ্রীতি জাগতিকপ্রীতিতে আরোহণ করিবার প্রথম সোপান। যাহারা এই সোপানে পদার্পণ না করে, তাহারা জাগতিকপ্রীতিতে আরোহণ করিতে পারে না।

শিষ্য। যীশু?

গুরু। যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় যাহারা পারে, তাহাদের ঈশ্বরাংশ বলিয়া মনুষ্যে স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাই প্রমাণ যে এই বিধি যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন আর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আর যীশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ধার্ম্মিকতা সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই।* আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যীশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।

অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি ভিন্ন স্বজনপ্রীতির ভিতর আরও কিছু আছে। (১) যাহারা অপত্যস্থানীয় তাহারাও অপত্যপ্রীতির ভাগী। (২) যাহারা শোণিত সম্বন্ধে আমাদের সহিত সম্বন্ধ, যথা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি, তাহারাও আমাদের প্রীতির পাত্র। সংসর্গজনিতই হউক, আত্মপ্রীতির সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রতি প্রীতি সচরাচর জন্মিয়া থাকে। (৩) এইরূপ প্রীতির সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটুম্বাদি ও প্রতিবাসিগণ প্রীতির পাত্র হয়, ইহা প্রীতির নৈসর্গিক বিস্তারকথন কালে বলিয়াছি। (৪) এমন অনেক ব্যক্তির সংসর্গে আমরা পড়িয়া থাকি যে, তাহারা আমাদের স্বজনমধ্যে গণনীয় না হইলেও তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের প্রতি বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি। এই বন্ধুপ্রীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া থাকে।

ঈদৃশ প্রীতিও অনুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সামঞ্জস্যের সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার অনুশীলন করিবে।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।—স্বদেশপ্রীতি।

গুরু। অনুশীলনের উদ্দেশ্য, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে স্ফুরিত ও পরিণত করিয়া, ঈশ্বরমুখী করা। ইহার সাধন, কর্ম্মীর পক্ষে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এজন্য সমস্ত জগৎ আত্মবৎ প্রীতির আধার হওয়া উচিত। জাগতিকপ্রীতির ইহাই মূল। এই মৌলিকতা দেখিতে পাইতেছ, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্মের। সমস্ত জগৎ কেন আপনার মত ভাল বাসিব? ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া। তবে, যদি এমন কাজ দেখি যে তাহাও

* "কৃষ্ণচরিত্র" নামক গ্রন্থে এই কথাটা বর্ত্তমান গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, কিন্তু এই জাগতিকপ্রীতির বিরোধী; তবে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? যদি দুই দিক্ বজায় না রাখা যায়, তবে কোন্ দিক্ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য?

শিষ্য। সে স্থলে বিচার করা কর্ত্তব্য। বিচারে যে দিক্ গুরু হইবে, সেই দিক্ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

গুরু। তবে, যাহা বলি, তাহা শুনিয়া বিচার কর। দম্পতী-প্রীতি-তত্ত্ব বুঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি যে, সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্ম্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। সমাজধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্ম্মধ্বংস। এবং সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গলধ্বংস। তোমার ন্যায় সুশিক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা বোধ করি বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। নিষ্প্রয়োজন। বাচস্পতি মহাশয় দেশে থাকিলে এ সকল বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত করার ভার তাঁরে দিতাম।

গুরু। যদি তাহাই হইল, যদি সমাজধ্বংসে ধর্ম্মধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস, তবে, সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। এই জন্য Herbert Spencer বলিয়াছেন, "The life of the social organism must, as an end, rank above the lives of its units." অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এবং এই জন্যই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন।

যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সেই কারণেই ইহা স্বজনরক্ষার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কেন না, তোমার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশ মাত্র, সমুদায়ের জন্য অংশ মাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয়।

আত্মরক্ষার ন্যায়, ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, কেন না ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্ত্তব্য।

যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার ন্যায় ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম হয়, তবে ইহাও নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে। ইহা যে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার অপেক্ষা সহজে নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহা বোধ করি কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। প্রশ্নটা উত্থাপিত করিয়া আপনি বলিয়াছিলেন, "বিচার কর।" এক্ষণে বিচারে কি নিষ্পন্ন হইল?

গুরু। বিচারে এই নিষ্পন্ন হইতেছে যে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যাদৃশ আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, আত্মরক্ষা স্বজনরক্ষা এবং দেশরক্ষা, আমার তাদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। উভয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যখন উভয়ে পরস্পরবিরোধী হইবে, তখন কোন্ দিক্ গুরু তাহাই দেখিবে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, দেশরক্ষা—জগৎরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, অতএব সেই দিক্ অবলম্বনীয়।

কিন্তু বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে, আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য কেন হইব? ক্ষুধার্ত্ত চোরের উদাহরণের দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। আর ইহাও বুঝাইয়াছি যে, জাগতিক প্রীতি এবং সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্যেরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্টসাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও তেমনি ইষ্টসাধন করিব। সাধ্যানুসারে, কেন না কোন সমাজের অনিষ্ট করিয়া অন্য কোন সমাজের ইষ্টসাধন করিব না। পর-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য। কয় দিন পূর্ব্বে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে। বোধ করি তোমার মনে ইউরোপীয় Patriotism ধর্ম্মের কথা জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম্ম না লিখেন। এখন বল, প্রীতিতত্ত্বের স্থূল তত্ত্ব কি বুঝিলে?

শিষ্য। বুঝিয়াছি যে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি।

এই ভক্তির ফল, জাগতিক প্রীতি। কেন না, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন।

এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই। আপাতত যে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই সকল বৃত্তিকে নিষ্কামতায় পরিণত করিতে আমরা যত্ন করি না এই জন্য। অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের অভাবে।

আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।

গুরু। ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবনতির কারণ পাইলে। ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্ব লোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিষ্য। ভারতবর্ষ আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে, ও কার্য্যে পরিণত করিলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিবে, তদ্বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।—পশুপ্রীতি।

গুরু। প্রীতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আর একটি কথা বাকি আছে। অন্য সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ তাহার সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রীতিতত্ত্ব যাহা তোমাকে বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার কত উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। হিন্দুদিগের জাগতিক প্রীতি যাহা তোমাকে বুঝাইয়াছি, তাহাতেই ইহার চমৎকার উদাহরণ পাইয়াছ। অন্য ধর্ম্মেও সর্ব্বলোকে প্রীতিযুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত মূল কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মের এই জাগতিক প্রীতি জগত্তত্ত্বে দৃঢ় বদ্ধমূল। ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতায় ইহার ভিত্তি। হিন্দুদিগের দম্পতিপ্রীতি সমালোচনায় আর একটি

এই শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায়; হিন্দুদিগের দম্পতিপ্রীতি অন্য জাতির আদর্শস্থল; হিন্দুধর্ম্মের বিবাহপ্রথা ইহার কারণ।* আমি এক্ষণে প্রীতিতত্ত্বঘটিত আর একটি প্রমাণ দিব।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। এই জন্য সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বভূত বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না। সমস্ত জীব সর্ব্বভূতান্তর্গত। অতএব পশুগণও মনুষ্যের প্রীতির পাত্র। মনুষ্যও যেরূপ প্রীতির পাত্র, পশুগণও সেইরূপ প্রীতির পাত্র। এইরূপ অভেদজ্ঞান আর কোন ধর্ম্মে নাই, কেবল হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন বৌদ্ধ ধর্ম্মে আছে।

শিষ্য। কথাটা বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে পাইয়াছে, না হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে পাইয়াছে?

গুরু। অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাস্য যে ছেলে বাপের বিষয় পাইয়াছে, না বাপ ছেলের বিষয় পাইয়াছে?

শিষ্য। বাপ কখন কখন ছেলের বিষয় পায়?

গুরু। যে প্রকৃতির গতিবিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, প্রমাণের ভার তাহার উপর। বৌদ্ধ পক্ষে প্রমাণ কি?

শিষ্য। কিছুই না বোধ হয়। হিন্দু পক্ষে প্রমাণ কি?

গুরু। ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কথাই যথেষ্ট। তাহা ছাড়া বাজসনেয় উপনিষৎ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দিয়াছি যে, সর্ব্বভূতের যে সাম্য, ইহা প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্ম।

শিষ্য। কিন্তু বেদে ত অশ্বমেধাদির বিধি আছে।

গুরু। বেদ যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষ-প্রণীত একখানি গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে না হয় বেদের প্রতি অসঙ্গতি দোষ দেওয়া যাইত। Thomas Acquinas সঙ্গে হর্বর্ট স্পেন্সরের সঙ্গতি খোঁজা যত দূর সঙ্গত, বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গতির সন্ধানও তত দূর সঙ্গত। হিংসা হইতে অহিংসায় ধর্ম্মের উন্নতি। যাক্। হিন্দুধর্ম্মবিহিত "পশুদিগের প্রতি অহিংসা" পরম রমণীয় ধর্ম্ম। যত্নে ইহার অনুশীলন করিবে। অহিন্দুরা যত্নে ইহার অনুশীলন করিয়া থাকে। খাইবার জন্য, বা চাষের জন্য, বা চড়িবার জন্য যাহারা গো মেষ অশ্বাদির পালন করে, আমি কেবল তাহাদের কথা বলিতেছি না। কুকুরের মাংস খাওয়া

* বাবু চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত হিন্দুবিবাহ বিষয়ক পুস্তিকা দেখ।

যায় না, তথাপি কত যত্নে খৃষ্টানেরা কুকুর পালন করে। তাহাতে তাহাদের কত সুখ। আমাদের দেশে কত স্ত্রীলোক বিড়াল পুষিয়া অপত্যহীনতার দুঃখ নিবারণ করে। একটি পক্ষী পুষিয়া কে না সুখী হয়? আমি একদা একখানি ইংরাজি গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,—যে বাড়ীতে দেখিবে পিঞ্জরে পক্ষী আছে, জানিবে সেই বাড়ীতে এক জন বিজ্ঞ মানুষ আছে। গ্রন্থখানির নাম মনে নাই, কিন্তু বিজ্ঞ মানুষের কথা বটে।

পশুদিগের মধ্যে গো হিন্দুদিগের বিশেষ প্রীতির পাত্র। গোরুর তুল্য হিন্দুর পরমোপকারী আর কেহই নহে। গোদুগ্ধ হিন্দুর দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ। হিন্দু, মাংস ভোজন করে না। যে অন্ন আমরা ভোজন করি তাহাতে পুষ্টিকর (nitrogenous) দ্রব্য বড় অল্প, গোরুর দুগ্ধ না খাইলে সে অভাব মোচন হইত না। কেবল গোরুর দুগ্ধ খাইয়াই আমরা মানুষ এমন নহে; যে ধান্যের উপর আমাদের নির্ভর, তাহার চাষও গোরুর উপর নির্ভর—গোরুই আমাদের অন্নদাতা। গোরু কেবল ধান্য উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত নহে; তাহা মাঠ হইতে গোলায়, গোলা হইতে বাজারে, বাজার হইতে ঘরে বহিয়া দিয়া যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত বহনকার্য্য গোরুই করে। গোরু মরিয়াও দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়, অস্থির দ্বারা, শৃঙ্গের দ্বারা ও চামড়ার দ্বারা উপকার করে। মূর্খে বলে, গোরু হিন্দুর দেবতা; দেবতা নহে, কিন্তু দেবতার ন্যায় উপকার করে। বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্র আমাদের যত উপকার করে, গোরু তাহার অধিক উপকার করে। ইন্দ্র যদি পূজার্হ হয়েন, গোরুও তবে পূজার্হ। যদি কোন কারণে বাঙ্গালা দেশে হঠাৎ গোবংশ লোপ পায়, তবে বাঙ্গালি জাতিও লোপ পাইবে সন্দেহ নাই। যদি হিন্দু, মুসলমানের দেখাদেখি গোরু খাইতে শিখিত, তবে হয় এত দিন হিন্দুনাম লোপ পাইত, নয় হিন্দুরা অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া থাকিত। হিন্দুর অহিংসা ধর্ম্মই এখানে হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে। অনুশীলনের ফল হাতে হাতে দেখ। পশুপ্রীতি অনুশীলিত হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দুর এ উপকার হইয়াছে।

শিষ্য। বাঙ্গালার অর্দ্ধেক কৃষক মুসলমান।

গুরু। তাহারা হিন্দুজাতিসম্ভূত বলিয়াই হউক, আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জন্যই হউক, আচারে ত তাহারা হিন্দু। তাহারা গোরু খায় না। হিন্দুবংশসম্ভূত হইয়া যে গোরু খায়, সে কুলাঙ্গার ও নরাধম।

শিষ্য। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, হিন্দুরা জন্মান্তরবাদী; তাহারা মনে করে, কি জানি আমাদের কোন্ পূর্ব্বপুরুষ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন্ পশু হইয়া আছেন, এই আশঙ্কায় হিন্দুরা পশুদিগের প্রতি দয়াবান্।

গুরু। তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতে ও পাশ্চাত্য গর্দ্দভে গোল করিয়া ফেলিতেছ। একণে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম কিছু কিছু বুঝিলে, একণে ডাক শুনিলে গর্দ্দভ চিনিতে পারিবে।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।—দয়া।

গুরু। ভক্তি ও প্রীতির পর দয়া। আর্ত্তের প্রতি যে বিশেষ প্রীতিভাব, তাহাই দয়া। প্রীতি যেমন ভক্তির অন্তর্গত, দয়া তেমনই প্রীতির অন্তর্গত। যে আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখে, সে সর্ব্বভূতে দয়াময়। অতএব ভক্তির অনুশীলনেই যেমন প্রীতির অনুশীলন, তেমনই প্রীতির অনুশীলনেই দয়ার অনুশীলন। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, হিন্দুধর্ম্মে এক সূত্রে গ্রথিত—পৃথক্ করা যায় না। হিন্দুধর্ম্মের মত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্ম্ম আর দেখা যায় না।

শিষ্য। তথাপি দয়ার পৃথক্ অনুশীলন হিন্দুধর্ম্মে অনুজ্ঞাত হইয়াছে।

গুরু। ভূরি ভূরি, পুনঃপুনঃ। দয়ার অনুশীলন যত পুনঃপুনঃ অনুজ্ঞাত হইয়াছে, এমন কিছুই নহে। যাহার দয়া নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এই সকল উপদেশে দয়া কথাটা তত ব্যবহৃত হয় নাই, যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দয়ার অনুশীলন দানে, কিন্তু দান কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। দান বলিলে সচরাচর আমরা অন্নদান, বস্ত্রদান, ধনদান, ইত্যাদিই বুঝি। কিন্তু দানের এরূপ অর্থ অতি সঙ্কীর্ণ। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ। ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব্দ। দয়ার অনুশীলনার্থ ত্যাগ শব্দও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ত্যাগ অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা উচিত নহে। সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ—আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত, বুঝিতে হইবে। অতএব যখন দানধর্ম্ম আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট হইল বুঝিতে হইবে। এইরূপ দানই যথার্থ দয়ার অনুশীলনমার্গ। নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, তাহার অত্যল্পাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে তাহাকে দয়া করা হইল না। কেন না, যেমন জলাশয় হইতে এক গণ্ডূষ জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের কোন প্রকার সঙ্কোচ হয় না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্গ হইল না। এরূপ দান যে না করে, সে ঘোরতর নরাধম বটে, কিন্তু যে করে সে একটা

বাহাদুর নয়। ইহাতে দয়া বৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন নাই। আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের উপকার করিবে, তাহাই দান।

শিষ্য। যদি আপনিই কষ্ট পাইলাম, তবে বৃত্তির অনুশীলনে সুখ হইল কৈ? অথচ আপনি বলিয়াছেন সুখের উপায় ধর্ম্ম।

গুরু। যে, বৃত্তিকে অনুশীলিত করে, তাহার সেই কষ্টই পরম পবিত্র সুখে পরিণত হয়। শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি—ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের অনুশীলনজনিত দুঃখ সুখে পরিণত হয়। এই বৃত্তিগুলি সকল দুঃখকেই সুখে পরিণত করে। সুখের উপায় ধর্ম্মই বটে, আর সেই যে কষ্ট, সেও যত দিন আত্মপর ভেদজ্ঞান থাকে, তত দিনই লোক তাহাকে কষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ ধর্ম্মানুমোদিত যে আত্মপ্রীতি, তাহার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহা ঈশ্বরানুমোদিত; এজন্য নিষ্কাম হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে। সামঞ্জস্যবিধি পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এক্ষণে দানধর্ম্ম যে ভাবে সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ শাস্ত্রকারেরা (সকলে নহে) বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজন্য দান করিবে। এখানে "পুণ্য"—স্বর্গাদি কাম্য বস্তু লাভের উপায়। দান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এই জন্য দান করিবে, ইহাই সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকারের ব্যবস্থা। এরূপ দানকে ধর্ম্ম বলিতে পারি না। স্বর্গলাভার্থ ধনদান করার অর্থ মূল্য দিয়া স্বর্গে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের জন্য টাকা দাদন দিয়া রাখা মাত্র। ইহা ধর্ম্ম নহে, বিনিময় বা বাণিজ্য। এরূপ দানকে ধর্ম্ম বলা ধর্ম্মের অবমাননা।

দান করিতে হইবে, কিন্তু নিষ্কাম হইয়া দান করিবে। দয়াবৃত্তির অনুশীলনজন্য দান করিবে; দয়াবৃত্তিতে, প্রীতিবৃত্তিরই অনুশীলন, এবং প্রীতি ভক্তিরই অনুশীলন, অতএব ভক্তি, প্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য দান করিবে, বৃত্তির অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তিতে ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মার্থেই দান করিবে, পুণ্যার্থ বা স্বর্গার্থ নহে। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন অতএব সর্ব্বভূতে দান করিবে; যাহা ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সর্ব্বস্বদানই মনুষ্যত্বের চরম। সর্ব্বভূতে এবং তোমাতে অভেদ, অতএব তোমার সর্ব্বস্বে তোমার, এবঞ্চ সর্ব্বলোকের অধিকার; যাহা সর্ব্বলোকের তাহা সর্ব্বলোককে দিবে। ইহাই যথার্থ হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত, গীতোক্ত ধর্ম্মের অনুমোদিত দান। ইহাই যথার্থ দানধর্ম্ম। নহিলে তোমার অনেক আছে, তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে। বিস্ময়ের বিষয়, এমন অনেক লোকও আছে যে তাহাও দেয় না।

শিষ্য। সকলকেই কি দান করিতে হইবে? দানের কি পাত্রাপাত্র নাই? আকাশের সূর্য্য সর্ব্বত্র করবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়। আকাশের মেঘ সর্ব্বত্র জলবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থান হাজিয়া ভাসিয়া যায়। বিচারশূন্য দানে কি সেরূপ আশঙ্কা নাই?

গুরু। দান, দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য। যে দয়ার পাত্র তাহাকেই দান করিবে। যে আর্ত্ত সেই দয়ার পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আর্ত্ত তাহাকেই দান করিবে—অপরকে নহে। সর্ব্বভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন বুঝায় না যে, যাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার দুঃখমোচনার্থ আত্মোৎসর্গ করিবে। তবে, কোন প্রকার দুঃখ নাই, এমন লোকও সংসারে পাওয়া যায় না। যাহার দারিদ্র্যদুঃখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে, যাহার রোগদুঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে। ইহা বলা কর্ত্তব্য, অনুচিত দানে অনেক সময়ে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি হয়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া, পৃথিবীতে যাহারা সৎকার্য্যে দিনযাপন করিতে পারে তাহারাও ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয়। অনুচিত দানে সংসারে আলস্য বঞ্চনা এবং পাপক্রিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অনেকে তাই ভাবিয়া কাহাকেও দান করেন না। তাঁহাদের বিবেচনায় সকল ভিক্ষুকই আলস্য বশতই ভিক্ষুক অথবা প্রবঞ্চক। এই দুই দিক্ বাঁচাইয়া দান করিবে। যাহারা জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণীবৃত্তি বিহিত অনুশীলিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন নহে। কেন না তাহারা বিচারক্ষম অথচ দয়াপর। অতএব মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয় না।

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগবদুক্তি আছে, তাহারও তাৎপর্য্য এইরূপ।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং॥

অর্থাৎ "দেওয়া উচিত এই বিবেচনায় যে দান, যাহার প্রত্যুপকার করিবার সম্ভাবনা নাই তাহাকে দান, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক দান। প্রত্যুপকার-প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশে যে দান, এবং অপ্রসন্ন হইয়া যে দান করা

যায়, তাহা রাজস দান। দেশ কাল পাত্র বিচারশূন্য যে দান, অনাদরে এবং অবজ্ঞাযুক্ত যে দান, তাহা তামস দান।"

শিষ্য। দানের দেশ কাল পাত্র কিরূপে বিচার করিতে হইবে, গীতায় তাহার কিছু উপদেশ আছে কি?

গুরু। গীতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যকারেরা সে কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারদিগের রহস্য দেখ। দেশ কাল পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার বাস্তবিক একটা বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। সকল কর্ম্মই দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া করিতে হয়। দানও সেইরূপ। দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে, দান আর সাত্ত্বিক হইল না, তামসিক হইল। কথাটার অর্থ সোজা বুঝিবার জন্য হিন্দুধর্ম্মের কোন বিশেষবিধির প্রয়োজন করে না। বাঙ্গালা দেশ দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে, মনে কর সেই সময়ে মাঞ্চেষ্টরে কাপড়ের কল বন্ধ—শিল্পীদিগের কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার থাকিলে, দুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল হয়, না পারিলে, কেবল বাঙ্গালায় যা পারি দিব। তাহা না দিয়া, যদি আমি সকলই মাঞ্চেষ্টরে দিই, তবে দেশ-বিচার হইল না। কেন না, মাঞ্চেষ্টরে দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কাল-বিচারও ঐরূপ। আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিলে, কাল হয়ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে প্রাণদান চাহিলে তুমি দিতে পারিবে না। পাত্রবিচার অতি সহজ—প্রায় সকলেই করিতে পারে। দুঃখীকে সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দিতে চাহে না। অতএব "দেশে কালে চ পাত্রে চ" এ কথার একটা সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই—যে উদার জাগতিক মহানীতি সকলের হৃদয়গত, ইহা তাহারই অন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারেরা কি বলেন তাহা দেখ। "দেশে"—কি না "পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ।" শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই ইহা বলেন। তার পর "কালে কি?" শঙ্কর বলেন, "সংক্রান্ত্যাদৌ"—শ্রীধর বলেন, "গ্রহণাদৌ।" পাত্রে কি? শঙ্কর বলেন, "ষড়ঙ্গবিদ্বেদপারগ ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠায়"—শ্রীধর বলেন, "পাত্র-ভূতায় তপঃব্রতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়।" সর্ব্বনাশ। আমি যদি স্বদেশে বসিয়া মাসের ১লা হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে কোন দিনে, অতি দীনদুঃখী পীড়িত কাতর এক জন মুচি কি ডোমকে কিছু দান করি, তবে সে দান, ভগবদভিপ্রেত দান হইল না! এইরূপে কখন কখন ভাষ্যকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার এবং সার্ব্বলৌকিক যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার উপধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। এখানে শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর

স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা ভগবদ্বাক্যে নাই। কিন্তু তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। ভগবদ্বাক্যকে স্মৃতির অনুমোদিত করিবার জন্য, সেই উদার ধর্ম্মকে অনুদার এবং সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই সকল মহা প্রতিভাসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহামহোপাধ্যায়গণের তুলনায়, আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকেরা পর্ব্বতের নিকট বালুকাকণা তুল্য, কিন্তু ইহাও কথিত আছে যে,—

> কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
> যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥ *

বিনা বিচারে, ঋষিদিগের বাক্য সকল মস্তকের উপর এত কাল বহন করিয়া আমরা এই বিশৃঙ্খলা, অধর্ম্ম এবং দুর্দ্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার বুদ্ধি অনুসারে সকলেরই বিচার করা উচিত। নহিলে আমরা চন্দনবাহী গর্দ্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই পীড়িত হইতে থাকিব—চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝিব না।

শিষ্য। তবে এখন, ভাষ্যকারদিগের হাত হইতে হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার করা, আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য।

গুরু। প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্য্যাদা বা অনাদর করিবে না। তবে যেখানে বুঝিবে যে, তাঁহাদিগের উক্তি, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সেখানে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরাভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।—চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি।

শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য কার্য্যকারিণীবৃত্তির অনুশীলনের পদ্ধতি শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। সে সকল বিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। আমার কাছে তাহা বিশেষ শুনিবার প্রয়োজন নাই। শারীরিকীবৃত্তি বা জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি সম্বন্ধেও আমি কেবল সাধারণ অনুশীলনপদ্ধতি বলিয়া দিয়াছি, বৃত্তিবিশেষ সম্বন্ধে অনুশীলনপদ্ধতি কিছু শিখাই নাই। কি প্রকারে শরীরকে বলাধান করিতে হইবে, কি প্রকারে অস্ত্রশিক্ষা বা অশ্বসঞ্চালন করিতে হইবে, কি প্রকারে মেধাকে তীক্ষ্ণ করিতে হইবে, বা কি প্রকারে

* মনু ১২ অধ্যায়, ১১৩শ শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট-ধৃত বৃহস্পতি-বচন।

বৃত্তিকে গণিতশাস্ত্রের উপযোগী করিতে হইবে, তাহা বলি নাই। কারণ সে সকল শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। অনুশীলনতত্ত্বের স্থূল মর্ম্ম বুঝিবার জন্য কেবল সাধারণ বিধি জানিলেই যথেষ্ট হয়। আমি শারীরিকী ও জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছি। কার্য্যকারিণীবৃত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু কার্য্যকারিণীবৃত্তি অনুশীলন সম্বন্ধে যে সাধারণ বিধি, তাহা ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত। প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং দয়া, প্রীতির অন্তর্গত। সমস্ত ধর্ম্মই এই তিনটি বৃত্তির উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর করে। এই জন্য আমি ভক্তি, প্রীতি, দয়া বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়াছি। নচেৎ সকল বৃত্তি গণনা করা, বা তাহার অনুশীলনপদ্ধতি নির্ব্বাচন করা আমার উদ্দেশ্য নহে, সাধ্যও নহে। শারীরিকী জ্ঞানার্জ্জনী বা কার্য্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

জগতের সকল ধর্ম্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন বিশেষরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারে না যে, প্রাচীন ধর্ম্মবেত্তারা ইহার আবশ্যকতা অনবগত ছিলেন, বা এ সকলের অনুশীলনের কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পূজার পুষ্প, চন্দন, মাল্য, ধূপ, দীপ, ধূনা, গুগ্‌গুল, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী-বৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন। প্রাচীন গ্রীকদিগের ধর্ম্মে, এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় খ্রীষ্টধর্ম্মে উপাসনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী-বৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তির ও পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আপিলীস্ বা রাফেলের চিত্র, মাইকেল এঞ্জিলো বা ফিদিয়সের ভাস্কর্য্য, জর্ম্মাণির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতৃগণের সঙ্গীত, উপাসনার সহায় হইয়াছিল। চিত্রকরের, ভাস্করের, স্থপতির, সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্যা ধর্ম্মের পদে উৎসর্গ করা হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, উপাসনার সহায়।

শিষ্য। তবে এমন হইতে পারে, প্রতিমাগঠন, উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার ফল।

গুরু। এ কথা সঙ্গত বটে,* কিন্তু প্রতিমাগঠনের যে অন্য কোন মূলও নাই, এমন কথা বলিতে পার না। প্রতিমাপূজার উৎপত্তি কি তাহা বিচারের স্থল এ নহে।

---

* এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা ইংরাজিতে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"The true explanation consists in the ever true relations of the subjective Ideal to its objective Reality. Man is by instinct a poet and an artist. The passionate yearnings of the heart for the Ideal

চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও তৃপ্তি বিধায়ক, কিন্তু কাব্যই চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য, গ্রীক ও রোমকে ধর্ম্মের সহায়, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মেই কাব্যের বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দুদিগের এক্ষণে প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য আছে যে, অন্য দেশে তাহা অতুলনীয়। অতএব হিন্দুধর্ম্মে যে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলনের অল্প মনোযোগ ছিল এমন নহে। তবে যাহা পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ না হইয়া কেবল লোকাচারেই ছিল, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মের অংশ বলিয়া বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। এবং জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির যেমন অনুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির সেইরূপ অনুশীলন ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা অনুজ্ঞাত করিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহারও হিংসা করিবে না, দান করিবে, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে, সেইরূপ আপনার এই ব্যাখ্যানুসারে ইহাও বিহিত হইবে যে, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং কাব্যের অনুশীলন করিবে?

গুরু। হাঁ। নহিলে মনুষ্যের ধর্ম্মহানি হইবে।

শিষ্য। বুঝিলাম না।

গুরু। বুঝ। জগতে আছে কি?

শিষ্য। যাহা আছে, তাই আছে।

গুরু। তাহাকে কি বলে?

শিষ্য। সৎ।

গুরু। বা সত্য। এখন, এই জগৎ ত জড়পিণ্ডের সমষ্টি। জাগতিক বস্তু নানাবিধ, ভিন্নপ্রকৃতি, বিবিধ গুণবিশিষ্ট। ইহার ভিতর কিছু ঐক্য দেখিতে পাও না? বিশৃঙ্খলার মধ্যে কি শৃঙ্খলা দেখিতে পাও না?

---

in beauty, in power, and in purity, must find an expression in the world of the Real. Hence proceed all poetry and all art. Exactly in the same way the ideal of the Divine in man receives a form from him, and the form an image. The existence of Idols is as justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of that of Prometheus. The *religious* worship of idols is as justifiable as the *intellectual* worship of Hamlet or Prometheus. The homage we owe to the ideal of the human realised in art is admiration. The homage we owe to the ideal of the Divine realised in idolatry is worship."

Statesman, Oct. 28, 1882.

এই তত্ত্ব সুলেখক বাবু চন্দ্রনাথ বসু নবজীবনের "ষোড়শোপচারে পূজা" ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধে এরূপ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, আমার উপরিধৃত দুই ছত্র ইংরেজির অনুবাদ এখানে দিবার প্রয়োজন আছে বোধ হয় না।

শিষ্য। পাই।

গুরু। কিসে দেখ?

শিষ্য। এক অনন্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তি—যাহাকে স্পেন্সর Inscrutable Power in Nature বলিয়াছেন, তাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাতেই সব বিলীন হইতেছে।

গুরু। তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলা যাউক। সেই চৈতন্যরূপিণী যে শক্তি তাহাকে চিৎশক্তি বলা যাউক। এখন বল দেখি, সতে এই চিদের অবস্থানের ফল কি?

শিষ্য। ফল ত এই মাত্র আপনিই বলিয়াছেন। ফল এই জাগতিক শৃঙ্খলা। অনির্ব্বচনীয় ঐক্য।

গুরু। বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বল, জীবের পক্ষে এই অনির্ব্বচনীয় শৃঙ্খলার ফল কি?

শিষ্য। জীবনের উপযোগিতা বা জীবের সুখ।

গুরু। তাহার নাম দাও আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে জানিলেই জগৎ জানিলাম। কিন্তু জানিব কি প্রকারে? এক একটা করিয়া ভাবিয়া দেখ। প্রথম, সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, সেই অস্তিত্বমাত্র জানিব কি প্রকারে?

শিষ্য। এই "সৎ" অর্থে, সতের গুণও বটে?

গুরু। হাঁ, কেন না সেই সকল গুণও আছে। তাহাই সত্য।

শিষ্য। তবে সৎ বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইবে।

গুরু। প্রমাণ কি?

শিষ্য। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। অন্য প্রমাণ আমি অনুমানের মধ্যে ধরি।

গুরু। ঠিক। কিন্তু অনুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ। অতএব সত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক।* প্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য ইন্দ্রিয় সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিক বৃত্তির সচ্ছন্দতাই যথেষ্ট। তার পর অনুমানজন্য জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি আবশ্যক। জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলিকে হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্রে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলির নাম বুদ্ধি বলা হইয়াছে। এই মন ও বুদ্ধির প্রভেদ কোন কোন ইউরোপীয় দার্শনিককৃত জ্ঞাপিকা এবং বিচারিকা বৃত্তি মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার সঙ্গে কতক মিলে। অনুমান জন্য

* সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে ইহা ভগবদ্গীতার টীকায় বুঝান গিয়াছে—পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

এই মনোনামযুক্ত বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখন এই সদ্ব্যাপী চিৎকে জানিবে কি প্রকারে ?

শিষ্য। সেও অনুমানের দ্বারা।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বুদ্ধি বা বিচারিকা বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহার অনুশীলনের দ্বারা। অর্থাৎ সৎকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা এবং চিৎকে জানিবে ধ্যানের দ্বারা। তার পর আনন্দকে জানিবে কিসের দ্বারা ?

শিষ্য। ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের বিষয়। আমরা আনন্দ অনুমান করি না—অনুভব করি, ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তির অপ্রাপ্য। অতএব ইহার জন্য অন্য জাতীয় বৃত্তি চাই।

গুরু। সেইগুলি চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি। তাহার সম্যক্ অনুশীলনে এই সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম যে, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্ম্মের হানি হয়। আমাদের সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার যত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার ধর্ম্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহা শক্তিমান্, বা উপকারী, বা সুন্দর, তাহারই উপাসনা এই আদিম বৈদিক ধর্ম্ম। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও চিতের উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। এই জন্য কালে তাহা উপনিষদ্ সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল। উপনিষদের ধর্ম্ম—চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা। তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তিই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্ম্মে কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না। এবং তাঁহাদের ধর্ম্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্ম্মের একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্ম্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম্ম হইবার উপযুক্ত, এবং এই কারণেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ত্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে পারে নাই। এক্ষণে যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের স্মরণ রাখ

কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বর যেমন সৎস্বরূপ, যেমন চিৎস্বরূপ, তেমন আনন্দস্বরূপ; অতএব চিত্তরঞ্জিনী-বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃত ধর্ম্ম কখন স্থায়ী হইবে না।

শিষ্য। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মে আনন্দের কিছু বাড়াবাড়ি আছে, সামঞ্জস্য নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

গুরু। অবশ্য। হিন্দুধর্ম্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে—ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে। তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই। এক্ষণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্য্যময়। তিনি যদি সগুণ হয়েন, তবে তাঁহার সকল গুণই আছে; কেন না তিনি সর্ব্বময়, এবং তাঁহার সকল গুণই অনন্ত। অনন্তের গুণ সান্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনন্তসৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট। তিনি মহৎ, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নির্ব্বিকার। এই সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য্য, তাহাও তাঁহাতে অনন্ত। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্য অনুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে? অতএব বুদ্ধ্যাদি জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তির, ভক্ত্যাদি কার্য্য-কারিণীবৃত্তির অনুশীলন, ধর্ম্মের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তিগুলির অনুশীলনও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। তাঁহার সৌন্দর্য্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও তাঁহার প্রতি সম্যক্ প্রেম বা ভক্তি জন্মিবে না। আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মে এই জন্য কৃষ্ণোপাসনার সঙ্গে কৃষ্ণের ব্রজলীলাকীর্ত্তনের সংযোগ হইয়াছে।

শিষ্য। তাহার ফল কি সুফল ফলিয়াছে?

গুরু। যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে, এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহার ফল সুফল। যে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে না, যাহার নিজের চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল। চিত্তশুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত, কেহই বৈষ্ণব হইতে পারে না। এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম অজ্ঞান বা পাপাত্মার জন্য নহে। যাহারা রাধাকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সুখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে—পৈশাচ।

সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে রাসলীলা অতি অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু আদৌ ইহা

ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র ; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেন না বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, বলিয়াছি, "পরানুরক্তিরীশ্বরে।" অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে ; কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই অপরের হউক বা না হউক, স্ত্রীজাতির জীবন সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্ত্তমান ; শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুসুমসুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকূজিত বৃন্দাবন-বনস্থলী, জড়প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী বংশী। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া কৃষ্ণে তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইল ; আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল,

> কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
> কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিং।
> অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাং।
> দুষ্ট কালিয় ! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
> বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে ॥
> অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
> অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া ॥ ইত্যাদি

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের অনুরাগিণী হইয়া, (অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন বলিতেছি তাহার সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল। রাসলীলা রূপকের ইহাই স্থূল তাৎপর্য্য এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মও সেই পথগামী। অতএব মনুষ্যত্বে, মনুষ্য জীবনে, এবং হিন্দুধর্ম্মে, চিত্তরঞ্জিনী-বৃত্তির কত দূর আধিপত্য বিবেচনা কর।

শিষ্য। এক্ষণে এই চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। জাগতিক সৌন্দর্য্যে চিত্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। জগৎ সৌন্দর্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইতে থাকিলে, ক্রমে অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যানুভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস পাইতে থাকিবে। সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির এই এক স্বভাব যে, তদ্দারা প্রীতি, দয়া, ভক্তি, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকল স্ফুরিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তবে একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তিতে আর কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে। এই জন্য সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে কবিরা কাব্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে অকর্ম্মণ্য হয়। এ কথার যাথার্থ্য এই পর্য্যন্ত যে, যাহারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন করে, অন্য বৃত্তিগুলির সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় না, অথবা "আমি প্রতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচনা ভিন্ন আর কিছু করিতে নাই," এই ভাবিয়া যাঁহারা ফুলিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহারাই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে যে সকল শ্রেষ্ঠ কবি, অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত পরিচালনা করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, তাঁহারা অকর্ম্মণ্য না হইয়া বরং বিষয়কর্ম্মে বিশেষ পটুতা প্রকাশ করেন। ইউরোপে শেক্ষপীয়র, মিলটন, দান্তে, গেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা বিষয়-কর্ম্মে অতি সুদক্ষ ছিলেন। কালিদাস না কি কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন। এখনকার লর্ড টেনিসন না কি ঘোরতর বিষয়ী লোক। চার্লস ডিকেন্‌স প্রভৃতির কথাও জান।

শিষ্য। কেবল নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের উপর চিত্ত স্থাপনেই কি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি হইবে?

গুরু। এ বিষয়ে মনুষ্যই মনুষ্যের উত্তম সহায়। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিশেষ সাহায্যকারী বিদ্যা সকল, মনুষ্যের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল সেই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসৌন্দর্য্যের অনুভবশক্তি এ সকলের দ্বারা বিশেষরূপে স্ফুরিত হয়। কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। তদ্দারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রেমিক হয়। এই জন্য কবি, ধর্ম্মের এক জন প্রধান সহায়। বিজ্ঞান বা ধর্ম্মোপদেশ, মনুষ্যত্বের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ। যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন নাই।

শিষ্য। কিন্তু কুকাব্যও আছে।

গুরু। সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করাদির স্থায় মনুষ্যজাতির শত্রু। এবং তাহাদিগকে তস্করাদির স্থায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।—উপসংহার।

গুরু। অনুশীলনতত্ত্ব সমাপ্ত করিলাম। যাহা বলিবার তাহা সব বলিয়াছি এমন নহে। সকল কথা বলিতে হইলে কথা শেষ হয় না। সকল আপত্তির মীমাংসা করিয়াছি এমন নহে; কেন না তাহা করিতে গেলেও কথার শেষ হয় না। অনেক কথা অস্পষ্ট বা অসম্পুর্ণ আছে, এবং অনেক ভুলও যে থাকিতে পারে তাহা আমার স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। আমি এমনও প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সকলই বুঝিয়াছ। তবে ইহার পুনঃপুনঃ পর্য্যালোচনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। তবে স্থূল মর্ম্ম যে বুঝিয়াছ, বোধ করি এমন প্রত্যাশা করিতে পারি।

শিষ্য। তাহা আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন।

১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

৫। এই সমস্ত বৃত্তি উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।

৬। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।

এই সকল স্থূল কথা।

গুরু। কই, শারীরিকীবৃত্তি, জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি, কার্য্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি এ সকলের তুমি ত নামও করিলে না?

শিষ্য। নিষ্প্রয়োজন। অনুশীলনতত্ত্বের স্থূল মর্ম্মে এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে বুঝিয়াছি, আমাকে অনুশীলনতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এই সকল নামের সৃষ্টি করিয়াছেন।

গুরু। তবে, তুমি অনুশীলনতত্ত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক। সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।*

---

* অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের কি সম্বন্ধ তাহা এই গ্রন্থমধ্যে বুঝাইলাম না। কারণ তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকায় "স্বধর্ম্ম" বুঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি। গ্রন্থের সম্পূর্ণতা রক্ষার জন্য (ঘ) চিহ্নিত ক্রোড়পত্রে তদংশ গীতার টীকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

ক্রোড়পত্র। ক।

(মল্লিখিত "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।)

ধর্ম্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতিশব্দের দ্বারা আগে নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া দেখ। প্রথম, ইংরেজ যাহাকে Religion বলে, আমরা তাহাকে ধর্ম্ম বলি, যেমন হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম। দ্বিতীয়, ইংরেজ যাহাকে Morality বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম্ম বলি, যথা অমুক কার্য্য "ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ" "মানবধর্ম্মশাস্ত্র" "ধর্ম্মসূত্র" ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায়, ইহার আর একটি নাম প্রচলিত আছে—নীতি। বাঙ্গালি একালে আর কিছু পারুক আর না পারুক "নীতিবিরুদ্ধ" কথাটা চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে। তৃতীয়, ধর্ম্ম শব্দে Virtue বুঝায়। Virtue ধর্ম্মাত্ম মনুষ্যের অভ্যস্ত গুণকে বুঝায়; নীতির বশবর্ত্তী অভ্যাসের উহা ফল। এই অর্থে আমরা বলিয়া থাকি অমুক ব্যক্তি ধার্ম্মিক, অমুক ব্যক্তি অধার্ম্মিক। এখানে অধর্ম্মকে ইংরেজিতে Vice বলে। চতুর্থ, রিলিজন বা নীতির অনুমোদিত যে কার্য্য তাহাকেও ধর্ম্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধর্ম্ম বলে। যথা দান পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, গুরুনিন্দা পরম অধর্ম্ম। ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই অধর্ম্মের নাম "sin"—পুণ্যের এক কথায় একটা নাম নাই—"good deed" বা তদ্রূপ বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা সাহেবেরা অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম্ম শব্দে গুণ বুঝায়, যথা চৌম্বুকের ধর্ম্ম লৌহাকর্ষণ। এস্থলে যাহা অর্থান্তরে অধর্ম্ম, তাহাকেও ধর্ম্ম বলা যায়; যথা, "পরনিন্দা—ক্ষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম্ম।" এই অর্থে মনু স্বয়ং "পাষণ্ড ধর্ম্মের" কথা লিখিয়াছেন, যথা—

"হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে, ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ্যস্য সোহদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ ॥"

পুনশ্চ—

"পাষণ্ডগণধর্ম্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ।"

আর ষষ্ঠতঃ, ধর্ম্ম শব্দ কখন কখন, আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মনু এই অর্থেই বলেন,—

"দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।"

এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে। এই মাত্র এক অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে; কাজেই অপসিদ্ধান্তে পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্য, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের সুমীমাংসা হয় না। এ গোলযোগ আজ নূতন নহে। যে সকল গ্রন্থকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোক ইহার উত্তম উদাহরণ। ধর্ম্ম কখন রিলিজনের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও অভ্যস্ত ধর্ম্মাত্মতার প্রতি, এবং কখন পুণ্যকর্ম্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে—নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্ম্মে, কর্ম্মের লক্ষণ অভ্যাসে ন্যস্ত হওয়াতে, একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম্ম (রিলিজন)—উপধর্ম্মসঙ্কুল, নীতি—ভ্রান্ত, অভ্যাস—কঠিন, এবং পুণ্য—দুঃখজনক হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল।

ক্রোড়পত্র। খ।

(ঐ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)

গুরু। রিলিজন কি?

শিষ্য। সেটা জানা কথা।

গুরু। বড় নয়—বল দেখি কি জানা আছে?

শিষ্য। যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস।

গুরু। প্রাচীন য়ীহুদীরা পরলোক মানিত না। য়ীহুদীদের প্রাচীন ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়?

শিষ্য। যদি বলি দেবদেবীতে বিশ্বাস।

গুরু। ঈস্‌লাম, খ্রীষ্টীয়, য়ীহুদ, প্রভৃতি ধর্ম্মে দেবী নাই। সে সকল ধর্ম্মে দেবও এক—ঈশ্বর। এগুলি কি ধর্ম্ম নয়?

শিষ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম্ম?

গুরু। এমন অনেক পরম রমণীয় ধর্ম্ম আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচন করিলে, বুঝা যায় যে, তৎপ্রণয়নের সমকালিক

আর্য্যদিগের ধর্ম্মে অনেক দেবদেবী ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই। বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই—যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেইগুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। অথচ তাঁহারা ধর্ম্মহীন নহেন, কেন না তাঁহারা কর্ম্মফল মানিতেন, এবং মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স্ কামনা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মও নিরীশ্বর। অতএব ঈশ্বরবাদ ধর্ম্মের লক্ষণ কি প্রকারে বলি? দেখ, কিছুই পরিষ্কার হয় নাই।

শিষ্য। তবে বিদেশী তার্কিকদিগের ভাষা অবলম্বন করিতে হইল—লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম্ম।

গুরু। অর্থাৎ Supernaturalism, কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পড়িলে দেখ। প্রেততত্ত্ববিদ্ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ধর্ম্মও নাই—ধর্ম্মের প্রয়োজনও নাই। রিলিজনকে ধর্ম্ম বলিতেছি মনে থাকে যেন।

শিষ্য। অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম্ম আছে। যথা Religion of Humanity.

গুরু। সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম্ম নয়।

শিষ্য। তবে আপনিই বলুন ধর্ম্ম কাহাকে বলিব।

গুরু। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" মীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। সর্ব্বত্র গ্রাহ্য উত্তর আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমি যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম, মীমাংসাকারের উত্তর শুন। তিনি বলেন "নোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ।" নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য। শুধু এইটুকু থাকিলে বলা যাইত, কথাটা বুঝি নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু যখন উহার উপর কথা উঠিল, "নোদনা প্রবর্ত্তকো বেদবিধিরূপঃ" তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে কি না।

শিষ্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক্ ধর্ম্মগ্রন্থ ততগুলি পৃথক্-প্রকৃতি-সম্পন্ন ধর্ম্ম মানিতে হয়। খ্রীষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল বিধিই ধর্ম্ম; মুসলমানও কোরাণ সম্বন্ধে ঐরূপ বলিবে। ধর্ম্মপদ্ধতি ভিন্ন হউক ধর্ম্ম বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? Religions আছে বলিয়া Religion বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি?

গুরু। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন যে "বেদপ্রতিপাদ্যপ্রয়োজনবদর্থো ধর্ম্মঃ।" এই সকল কথার পরিণাম ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, যাগাদিই ধর্ম্ম এবং সদাচারই ধর্ম্ম শব্দে বাচ্য হইয়া গিয়াছে—যথা মহাভারতে

> শ্রদ্ধা কর্ম্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ।
> স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিত্তানসূয়িতা॥
> আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ॥

কেহ বা বলেন, "দ্রব্যক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্ম্মত্বং" এবং কেহ বলেন, ধর্ম্ম অদৃষ্ট বিশেষ। ফলত আর্য্যদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা লোকাচার সম্মত কার্য্যই ধর্ম্ম, যথা বিশ্বামিত্র—

> যমার্য্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শং সন্ত্যাগমবেদিনঃ।
> সধর্ম্মো যং বিগর্হন্তি তমধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরাচ," ইত্যাদি শ্রুতিতে সূচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও তদনুবর্ত্তী যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞানই পরমধর্ম্ম। ভগবদ্গীতার স্থূল তাৎপর্য্যই কর্ম্মাত্মক বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষত হিন্দু-ধর্ম্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দু-ধর্ম্মবাদের সাধারণত বিরোধী। যেখানে এই ধর্ম্ম দেখি—অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্যত্র, কি ভাগবতে—সর্ব্বত্রই দেখি, শ্রীকৃষ্ণই ইহার বক্তা। এই জন্য আমি হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণপর্ব্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহার উদাহরণ দিতেছি।

"অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণীগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রকদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম্ম নাম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণীগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম" ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পরে বনপর্ব্ব হইতে ধর্ম্মব্যাধোক্ত ধর্ম্মব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। "যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক

তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয়লাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।" এস্থলে ধর্ম্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

শিষ্য। এ দেশীয়েরা ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের ব্যাখ্যা। রিলিজনের ব্যাখ্যা কই?

গুরু। রিলিজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য আমাদের দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা, আমার মনে নাই, আমার পরিচিত কোন শব্দে কি প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে পারে?

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। তবে, আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়া শুনাই।

"For religion, the ancient Hindu had no name, because his conception of it was so broad as to dispense with the necessity of a name. With other peoples, religion is only a part of life; there are things religious, and there are things lay and secular. To the Hindu, his whole life was religion. To other peoples, their relations to God and to the spiritual world are things sharply distinguished from their relations to man and to the temporal world. To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and his temporal life are incapable of being so distinguished. They form one compact and harmonious whole, to separate which into its component parts is to break the entire fabric. All life to him was religion, and religion never received a name from him, because it never had for him an existence apart from all that had received a name. A department of thought which the people in whom it had its existence had thus failed to differentiate, has necessarily *mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what makes it so difficult at the present day, to erect it into a separate entity.*"*

শিষ্য। তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্য্যদিগের মতই শুনা যাউক।

গুরু। তাহাতেও বড় গোলযোগ। প্রথমত, রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই যে *re-ligare* হইতে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন,—ইহা সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে।

---

* লেখক-প্রণীত কোন ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল, উহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মর্ম্মার্থ বাঙ্গালায় এখানে সন্নিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালায় এ রকমের কথা আমার অনেক পাঠকে বুঝিবেন না। যাঁহাদের জন্য লিখিতেছি তাঁহারা না বুঝিলে, লেখা বৃথা। অতএব এই রুচিবিরুদ্ধ কার্য্যটুকু পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না, তাঁহারা এটুকু ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইবে না।

রোমক পণ্ডিত কিকিরো (বা সিসিরো) বলেন যে, ইহা re-ligere হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ। মক্ষমুলর প্রভৃতি এই মতানুযায়ী। যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে এ শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমনি স্ফুরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শিষ্য। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম্ম অর্থাৎ রিলিজন কাহাকে বলিব, তাই বলুন।

গুরু। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধর্ম্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা religio শব্দের অনুরূপ। ধর্ম্ম=ধৃ+মন্ (ধ্রিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা) এই জন্য আমি ধর্ম্মকে religio শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

শিষ্য। তা হৌক—এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্যা বলুন।

গুরু। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জর্ম্মানেরাই সর্ব্বাগ্রগণ্য। দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজে জর্ম্মান জানি না। অতএব প্রথমত মক্ষমূলরের পুস্তক হইতে জর্ম্মানদিগের মত পড়িয়া শুনাইব। আদৌ, কাণ্টের মত পর্য্যালোচনা কর।

"According to Kant, religion is morality. When we look upon all our moral duties as divine Commands, that, he thinks constitutes religion. And we must not forget that Kant does not consider that duties are moral duties because they rest on a divine command (that would be according to Kant merely revealed Religion); on the contrary, he tells us that because we are directly conscious of them as duties, therefore we look upon them as divine commands."

তার পর ফিক্তে। ফিক্তের মতে "Religion is knowledge. It gives to a man a clear insight into himself, answers the highest questions, and thus imparts to us a complete harmony with ourselves, and a thorough sanctification to our mind." সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল শব্দপ্রয়োগ ভিন্ন প্রকার; তার পর স্লিয়ের মেকর। তাঁহার মতে,—"Religion consists in our consciousness of absolute dependence on something, which though it determines us, we cannot determine in our turn." তাঁহাকে উপহাস করিয়া হীগেল বলেন,—"Religion is or ought to be perfect freedom; or it is neither more or less than the divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit—" এ মত কতকটা বেদান্তের অনুগামী।

শিষ্য। যাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটির একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইল না। আচার্য্য মক্ষমূলরের নিজের মত কি?

গুরু। তিনি বলেন, "Religion is a subjective faculty for the apprehension of the Infinite."

শিষ্য। Faculty! সর্ব্বনাশ! বরং রিলিজন বুঝিলে বুঝা যাইবে,—Faculty বুঝিব কি প্রকারে? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

গুরু। এখন জর্ম্মানদের ছাড়িয়া দিয়া দুই এক জন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টেলর সাহেব বলেন যে, যেখানে "Spiritual Beings" সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেইখানেই রিলিজন। এখানে "Spiritual Beings" অর্থে কেবল ভূত প্রেত নহে—লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত; দেবদেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্গত। অতএব তোমার বাক্যের সহিত ইঁহার বাক্যের ঐক্য হইল।

শিষ্য। সে জ্ঞান ত প্রমাণাধীন।

গুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব মৌস্লকের বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন।

শিষ্য। তিনি ত নীতিমাত্রবাদী, ধর্ম্মবিরোধী।

গুরু। তাঁহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে দ্বিধাযুক্ত বটে।—যাই হৌক, তাঁহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্ম সকল সম্বন্ধে বেশ খাটে।

তিনি বলেন "The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence, and is rightfully paramount over all selfish objects of desire."

শিষ্য। কথাটা বেশ।

গুরু। মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য্য সীলীর কথা শোন। আধুনিক ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যাকারকদিগের মধ্যে তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রণীত "Ecce Homo" এবং "Natural Religion" অনেককেই মোহিত করিয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার একটি উক্তি বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে।* বাক্যটি এই "*The substance of Religion is Culture.*" কিন্তু তিনি এক দল লোকের মতের সমালোচনকালে, এই উক্তির দ্বারা তাঁহাদিগের মত পরিস্ফুট করিয়াছেন—এটি ঠিক তাঁহার নিজের মত

* দেবী চৌধুরাণীতে।

নহে। তাঁহার নিজের মত বড় সর্ব্বব্যাপী। সে মতানুসারে রিলিজন "*habitual and permanent admiration.*" ব্যাখ্যাটি সবিস্তারে শুনাইতে হইল।

"The words Religion and Worship are commonly and conveniently appropriated to the feelings with which we regard God. But those feelings—love, awe, admiration, which together make up worship—are felt in various combinations for human beings, and even for inanimate objects. It is not exclusively but only *par excellence* that religion is directed towards God. When feelings of admiration are very strong and at the same time serious and permanent, they express themselves in recurring acts, and hence arises ritual, liturgy and whatever the multitude identifies with religion. But without ritual, religion may exist in its elementary state and this elementary state of Religion is what may be described as *habitual and permanent admiration.*"

শিষ্য। এ ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল যে কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার ঐক্য হইতেছে। এই "habitual and permanent admiration" যে মানসিক ভাব, তাহারই ফল, "strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence."

গুরু। এ ভাব, ধর্ম্মের একটি অঙ্গমাত্র।

যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া, অগুস্ত কোম্তের ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কেন না কোম্ৎ নিজে একটি অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তাঁহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, "Religion, in itself expresses the state, of perfect *unity* which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose." অর্থাৎ "Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying-point for all the separate individuals."

যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

শিষ্য। আগে ধর্ম্ম কি বুঝি, তার পর, পারি যদি তবে না হয়, হিন্দুধর্ম্ম বুঝিব। এই সকল পণ্ডিতগণকৃত ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পড়িল।

গুরু। কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না তেমনই সমগ্র ধর্ম্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক্, শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য,—তাঁহারাও ধর্ম্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশি দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোন মনুষ্য প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।

ক্রোড়পত্র। গ।

(অষ্টম অধ্যায় দেখ।)

If, as the sequence of a malady contracted in pursuit of illegitimate gratification, an attack of iritis injures vision, the mischief is to be counted among those entailed by immoral conduct; but if, regardless of protesting sensations, the eyes are used in study too soon after ophthalmia, and there follows blindness for years or for life, entailing not only personal unhappiness but a burden on others, moralists are silent. The broken leg which a drunkard's accident causes, counts among those miseries brought on self and family by intemperance, which form the ground for reprobating it; but if anxiety to fulfil duties prompts the continued use of a sprained knee in spite of the pain, and brings on a chronic lameness involving lack of exercise, consequent ill-health, inefficiency, anxiety, and unhappiness, it is supposed that ethics has no verdict to give in the matter. A student who is plucked because he has spent in amusement the time and money that should have gone in study, is blamed for thus making parents unhappy and preparing for himself a miserable future; but another who, thinking exclusively of claims on him, reads night after night with hot or aching head, and, breaking down, cannot take his degree, but returns home shattered in health and unable to support himself, is named with pity only, as not subject to any moral judgment; or rather, the moral judgment passed is wholly favourable.

Thus recognizing the evils caused by some kinds of conduct only, men at large, and moralists as exponents of their beliefs, ignore the suffering and death daily caused

around them by disregard of that guidance which has established itself in the course of evolution. Led by the tacit assumption, common to Pagan stoics and Christian ascetics, that we are so diabolically organized that pleasures are injurious and pains beneficial, people on all sides yield examples of lives blasted by persisting in actions against which their sensations rebel. Here is one who, drenched to the skin and sitting in a cold wind, pooh-poohs his shiverings and gets rheumatic fever with subsequent heart-disease, which makes worthless the short life remaining to him. Here is another who, disregarding painful feelings, works too soon after a debilitating illness, and establishes disordered health that lasts for the rest of his days, and makes him useless to himself and others. Now the account is of a youth who, persisting in gymnastic feats spite of scarcely bearable straining, bursts a blood-vessel, and, long laid on the shelf, is permanently damaged; while now it is of a man in middle life who, pushing muscular effort to painful excess, suddenly brings on hernia. In this family is a case of aphasia, spreading paralysis, and death, caused by eating too little and doing too much; in that, softening of the brain has been brought on by ceaseless mental efforts against which the feelings hourly protested; and in others, less serious brain-affections have been contracted by overstudy continued regardless of discomfort and the craving for fresh air and exercise.* Even without accumulating special examples, the truth is forced on us by the visible traits of classes. The careworn man of business too long at his office, the cadaverous barrister pouring half the night over his briefs, the feeble factory hands and unhealthy seamstresses passing long hours in bad air, the anæmic, flat-chested school girls, bending over many lessons and forbidden boisterous play, no less than Sheffield grinders who die of suffocating dust, and peasants crippled with rheumatism due to exposure, show us the widespread miseries caused by persevering in actions repugnant to the sensations and neglecting actions which the sensations prompt. Nay the evidence is still more extensive and conspicuous. What are the puny malformed children, seen in poverty-stricken districts, but children whose appetites for food and desires for warmth have not been adequately satisfied? What are populations stunted in growth and prematurely aged, such as parts of France show us, but populations injured by work in excess and food in defect: the one implying positive pain the other negative pain? What is the implication of that greater mortality which occurs among people who are weakened by privations, unless it is that bodily miseries conduce to fatal illnesses? Or once more, what must we infer from the frightful amount of disease and death suffered by armies in the field, fed on scanty and bad provisions, lying on damp ground, exposed to extremes of heat and cold, inadequately sheltered from rain, and subject to exhausting efforts; unless it be the terrible mischiefs caused by continuously subjecting the body to treatment which the feelings protest against?

* I can count up more than a dozen such cases among those personally well known to me.

It matters not to the argument whether the actions entailing such effects are voluntary or involuntary. It matters not from the biological point of view, whether the motives prompting them are high or low. The vital functions accept no apologies on the ground that neglect of them was unavoidable, or that the reason for neglect was noble. The direct and indirect sufferings caused by nonconformity to the laws of life, are the same whatever induces the nonconformity; and cannot be omitted in any rational estimate of conduct. If the purpose of ethical inquiry is to establish rules of right living; and if the rules of right living are those of which the total results, individual and general, direct and indirect, are most conducive to human happiness; then it is absurd to ignore the immediate results and recognize only the remote results. —Herbert Spencer: *Data of Ethics*, pp. 93-95.

ক্রোড়পত্র। ঘ।

(অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের সম্বন্ধ।)

"বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম্ম করি, না হয় কিছু জানি। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই। *

অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধর্ম্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুশীলিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না। † কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্ম্ম স্থানীয় করেন, কেহ কর্ম্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। এজন্য জ্ঞানার্জ্জন যাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মণ্‌ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্ম্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্ব্বিষয় আছে ও বহির্ব্বিষয় আছে। অন্তর্ব্বিষয় কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; বহির্ব্বিষয়ই কর্ম্মের বিষয়। সেই

---

* কোম্‌ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, "Thought, Feeling, Action," ইহা ন্যায্য। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিম্বা Action প্রাপ্ত হয়। এই জন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দ্বিবিধ বলাও ন্যায্য।

† আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি।

বহির্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হৌক, অথবা সবই হৌক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা, (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধর্ম্মী; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্য ধর্ম্মী; (৩) এবং যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধধর্ম্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি?

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শূদ্রের ধর্ম্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই কৃষি প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। যখন জ্ঞানধর্ম্মী, যুদ্ধধর্ম্মী, বাণিজ্যধর্ম্মী বা কৃষিধর্ম্মীর কর্ম্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধর্ম্মীগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জ্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম।"

ভগবদ্গীতার টীকায় যাহা লিখিয়াছি তাহা হইতে এই কয়টি কথা উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন প্রয়োজনীয়। তবে কথা এই যে যাহার যে স্বধর্ম্ম, অনুশীলন তদনুবর্ত্তী না হইলে সে স্বধর্ম্মের সুপালন হইবে না। অনুশীলন স্বধর্ম্মানুবর্ত্তী হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধর্ম্মের প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন চাই।

সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনুশীলনের কথা লেখা গেল না। আমি এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের কথাই বলিয়াছি, কেন না তাহাই ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্গত; বিশেষ অনুশীলনের কথা বলি নাই, কেন না তাহা শিক্ষাতত্ত্ব। উভয়ে কোন বিরোধ নাই, ও হইতে পারে না, ইহাই আমার এখানে বলিবার প্রয়োজন।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র

পৃ.	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮০	৩	ঈশ্বরবত্তদর্থং	ঈশ্বরত্তদর্থং
৮৭	১৯	বুদ্ধিমাত্রলোত্তা,	বুদ্ধিমাত্রলভ্যা,
৮৮	১৪	অষ্টমে	নবমে
৯৯	১৯	তাহাদেও	তাহাতেও
১০৫	২৫	বিষ্ণোন নিরীক্ষতে	বিষ্ণোন নিরীক্ষতো
১০৮	১৬	ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি	ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি
১০৯	৮	অনীশ্বর	ঈশ্বর
১১৫	২ (পাদটীকা)	ভূতাত্মাত্মান্যেবানুপশ্যতি	ভূতাত্মান্যেবানুপশ্যতি
১৩১	৯	মনুষ্যেব	মনুষ্যের
১৫০	১৯	বৃত্তি	বৃত্তির
১৫৭	২৫	প্রকার ;	প্রকার।
	২৮	or	for
১৫৮	৮	টেলর	টৈলর

পাঠভেদ

পৃ. ৩, পংক্তি ২২, "ইহজন্মের" স্থলে দ্বিতীয় সংস্করণে "এ জন্মেরই" ছিল।

পৃ. ৪, পংক্তি ২০, "শরীর রক্ষা ও" স্থলে "শারীরিক ও মানসিক" ছিল।

পৃ. ৫, পংক্তি ৮, "ইহজন্মকৃত" স্থলে "এইজন্মকৃত" ছিল।

৯, "অবশ্য।" কথাটির পর একটি *-চিহ্ন এবং পাদটীকায় ছিল—

* মানুষের যে সকল সুখদুঃখ আছে, মানুষের স্বকৃত কর্ম্ম ভিন্ন তাহার অন্য কারণও আছে। সে কথা স্থানান্তরে বলিব।

পৃ. ৫, পংক্তি ২৪, "দ্বিজবর্ণের" স্থলে "দ্বিজাতির" ছিল।

পৃ. ৭, পংক্তি ৩, "তুমি স্বীকার করিবে।" কথাগুলির পর একটি *-চিহ্ন ছিল এবং পাদটীকায় ছিল—

* সত্য বটে যে সুখদুঃখের বাহ্য অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উভয়ই বাহ্য অস্তিত্বযুক্ত কারণের অধীন। তাহা হইলেও সুখদুঃখরূপ মানসিক অবস্থা যে অনুশীলনের অধীন এ কথা অপ্রমাণ হইতেছে না।

পৃ. ১০, পংক্তি ২৩, "এককালীন" স্থলে "সম্পূর্ণ" ছিল।

পৃ. ১১, পংক্তি ১-২, "তজ্জনিত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি।" স্থলে ছিল—
তজ্জনিত স্ফূর্ত্তি, অবস্থার উপযোগী প্রয়োজনসিদ্ধি ও পরিণতি।

পৃ. ১১, পংক্তি ৩, "পরস্পর সামঞ্জস্য" স্থলে "পরস্পর অবস্থোপযোগী সামঞ্জস্য" ছিল।

পৃ. ১১, পংক্তি ৪, "তাদৃশ অবস্থায়" কথা দুইটির পর "কার্য্য সাধন দ্বারা" ছিল।

পৃ. ১১, পংক্তি ১২, "সে কখনও ধার্ম্মিক নহে।" কথাগুলির পর একটি *-চিহ্ন ছিল এবং পাদটীকায় ছিল—

* পূর্ব্বপুরুষকৃত কর্ম্মের ফলাফল বাদ দিয়া এ কথা বলিতে হয়; দেশকালপাত্রভেদ বাদ দিয়াও এ কথা বলিতে হয়। সে সকল কথার মীমাংসা দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব জটিল করিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই।

পৃ. ১৩, পংক্তি ৪-১৬, এই কয় পংক্তির স্থলে ছিল—

গুরু। যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ, না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম।

শিষ্য। তাহার নাম কি?

গুরু। মনুষ্যত্ব।

পৃ. ১৩, পংক্তি ১৮–১৯, "গুরু। মনুষ্যত্ব বুঝিলে...বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ।"
কথা কয়টির স্থানে ছিল—

শিষ্য। কাল আপনি আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ হয়, না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। এ একটা কথার মার পেঁচ বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন না মানুষ জন্মিলেই মানুষ, মরিলেই আর মানুষ নয়—ভস্মরাশি ধূলারাশি মাত্র। অতএব আমি বলিব যে জীবন থাকিলেই মানুষ মানুষ, নহিলে মানুষ মানুষ নয়। বোধ হয় তাহা আপনার উদ্দেশ্য নহে।

গুরু। দুগ্ধপোষ্য শিশুরও জীবন আছে, সে কি মানুষ?

শিষ্য। নয় কেন? কেবল বয়স কম। ছোট মানুষ।

গুরু। মানুষে যা পারে, সে সব পারে?

শিষ্য। কোন মনুষ্যই কি তা পারে? ঐ ভারীর কাঁধে যে জলের ভার তাহা মনুষ্য বহিতেছে। লিয়র বা কুমারসম্ভব মনুষ্যে প্রণীত করিয়াছে। উস্তলিজ্ বা লিউথেনের রণজয় মনুষ্যে করিয়াছিল। আপনি মনুষ্য—আপনি কি এ সকল পারেন? অথবা অন্য কোন মনুষ্যের নাম করিতে পারেন যে এই সকল কার্য্যগুলিই পারে?

গুরু। আমি পারি না। আমি এমন কোন মানুষের নাম করিতে পারিতেছি না যে পারে। তবে এ কথা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি যে কোন মনুষ্য কখন জন্মিবে না যে একা এ সকল কাজ পারিবে না; অথবা এমন কোন মনুষ্য কখন জন্মে নাই যে মনুষ্যে সাধ্য সমস্ত কাজ একা পারিত না।

শিষ্য। পারিত যদি—ত পারে নাই কেন?

গুরু। আপনার ক্ষমতার অনুশীলনের অভাবে।

শিষ্য। ইহাতেও কিছুই বুঝিলাম না, কি থাকিলে মানুষ মানুষ হয়। আপনার শক্তির অনুশীলনে? বর্ব্বর, যাহার কোন শক্তিই অনুশীলিত হয় নাই, তাহাকে কি মানুষ বলিবেন না?

গুরু। এমন কোন বর্ব্বর পাইবে না যাহার কোন শক্তি অনুশীলিত হয় নাই। প্রস্তরযুগের মানুষদিগেরও কতকগুলি শক্তি অনুশীলিত হইয়াছিল, নহিলে তাহারা পাথরের অস্ত্র গড়িতে পারিত না। তবে কথাটা এই যে তাহাদের মনুষ্য বলিব কি না? সে কথায় উত্তর দিবার আগে বৃক্ষ কি বুঝাই। মনুষ্যত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব কি বুঝ।

পৃ. ১৪, পংক্তি ৩, "মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি" কথা কয়টির পর "অনুশীলিত হইয়া" কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ১৪, পংক্তি ৬, "চিপেবার সে মনুষ্যত্ব নাই।" কথাগুলির পর ছিল—

শিষ্য। বংশ বা বীজ কি তাহার একটা প্রধান কারণ নহে?

গুরু। সে কথা এখন থাক্। যাহা অমিশ্র তাহা বুঝ। তার পর যাহা বিমিশ্র তাহা বুঝিও।

পৃ. ১৫, পংক্তি ১৫, "যে শিশু দেখিতেছ," কথা কয়টির স্থানে ছিল—

যে শিশুর কথা বলিলে

পৃ. ১৫, পংক্তি ২১, "কখন হয় নাই।" কথা কয়টির স্থলে ছিল—

হইয়াছে এমন কথা আমরা জানি না,

পৃ. ১৮, পংক্তি ৮, "লেখকদিগের" কথাটির স্থলে ছিল—

ইতিহাস পুরাণাদির রচয়িতৃগণের

পৃ. ১৯, পংক্তি ১২, "ঈশ্বরানুকৃত" কথাটি ছিল না।

২৪-২৫, "ধর্ম্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ…প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ।" এই অংশটি ছিল না।

পৃ. ২০, পংক্তি ২, "খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ।" কথা কয়টির স্থলে ছিল—

খ্রিষ্টিয়ানের আদর্শ এককালে ছিলেন, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ ছিলেন।

পৃ. ২৮, পংক্তি ৬, "কেন, আমি বুঝিতে পারি না।" স্থলে ছিল—

না করিলেও চলে।

পৃ. ৩০, পংক্তি ৬, প্রথম "কোন" কথাটি ছিল না।

পৃ. ৩৪, পংক্তি ১৭, "সকলেই কামনা করে।" কথা কয়টির পর একটি *-চিহ্ন ছিল এবং পাদটীকায় ছিল—

* ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা। গীতা, ৪।১২

পৃ. ৩৯, পংক্তি ২৪, "এমন সম্ভব।" কথা দুইটির পর একটি *-চিহ্ন ছিল এবং পাদটীকায় ছিল—

* প্রাচীন বয়সে যে কাহারও কাহারও অনুশীলিত বৃত্তিরও দুর্ব্বলতা দেখা যায়, প্রায় তাহার তাহা শারীরিক দুরবস্থা প্রযুক্ত। শারীরিক বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হয় নাই। নইলে সকলের হয় না কেন?

পৃ. ৪৪, পংক্তি ১৫, "ইতি গজঃ" কথা দুইটির পর একটি *-চিহ্ন ছিল এবং পাদটীকায় ছিল—

* "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এমন কথাটা মহাভারতে নাই। "হতঃ কুঞ্জরঃ" এই কথাটা আছে।

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২২, "উভয়ের রক্ষার কথা।" কথা কয়টির পর ছিল—

এবং ধর্ম্মোন্নতির পথ মুক্ত রাখিবারও কথা। তাহা বুঝাইতেছি।

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২৮, "উৎপীড়ন" কথাটির স্থলে "উদাহরণ" ছিল।

পৃ. ৫১, পংক্তি ৪, "অনুশীলনে সুখ," কথা দুইটির মধ্যে "যে" কথাটি ছিল।

পৃ. ৫৪, পংক্তি ৩, "শাসনকর্ত্তারূপ" কথাটির স্থলে "শাসনকর্ত্তৃরূপ" ছিল।

পৃ. ৫৬, পংক্তি ১২, ১৩, "তিনটি" কথাটি দুই স্থলেই "দুইটি" ছিল।

১২, "ভক্তি প্রীতি দয়া" স্থলে "ভক্তি ও প্রীতি" ছিল।

১৩, "দয়া," কথাটি ছিল না।

১৪, "এবং আর্ত্তে... দয়া হইল।" কথাগুলির স্থলে "না কি?" কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৫৬, পংক্তি ১৬, "তিনটিকে" স্থলে "দুটীকে" ছিল।

১৮, "তাই, বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা," হইতে পর-পৃষ্ঠার ১২ পংক্তির "পারা যায়।" অংশটুকু ছিল না।

পৃ. ৬০, পংক্তি ৬, "পরের জন্য নহে," কথা তিনটি ছিল না।

২১, "অনন্তজ্ঞানী" কথাটি "হিন্দুধর্ম্মের" কথাটির পর ছিল।

পৃ. ৬২, পংক্তি ৮, "ব্রাহ্মণের মত" কথা দুইটি ছিল না।

৯-১২, এই পংক্তি কয়টি ছিল না।

পৃ. ৬৩, পংক্তি ১৯, "একটা সর্ব্বনিকৃষ্ট" কথা দুইটির স্থলে "নিকৃষ্ট" কথাটি ছিল।

পংক্তি ২০, "ভয়ের মত" কথা দুইটির পূর্ব্বে "ভক্তিশূন্য" কথাটি ছিল।

পংক্তি ২১, "কিন্তু কদাচ" কথা দুইটি পর "অকারণ" কথাটি ছিল।

পৃ. ৭১, পংক্তি ৫, "এই ছিদ্রেই...ভক্তিবাদী বলিলেন," স্থলে ছিল—

যে না পারে, তাহার জন্য ভক্তিমার্গ। ভক্তিবাদী বলেন,

পৃ. ৭৮, পংক্তি ২৩, এই পংক্তির শেষে "২। ৪৮।" ছিল।

পৃ. ৮২, পংক্তি ১০, "জানিবে" স্থলে "জানিব" ছিল।

পৃ. ৯২, পংক্তি ১৪, "এবং যিনি...প্রাপ্ত হন না," কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ১১০, পংক্তি ১৫-১৬, "জীবন্মুক্তিই সুখ।...তত সুখ নাই।" এই অংশ ছিল না।

পৃ. ১২০, পংক্তি ৩, শেষ কথা "নই" স্থলে "নাই" ছিল।

পৃ. ১৩০, পংক্তি ২১-২৪ "অভ্যাসে ও অনুশীলনে...সর্ব্বত্র কর্ত্তব্য।" অংশটুকুর পরিবর্ত্তে ছিল—

অভ্যাসজনিত বিকৃতির দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এসকল বিচার না করিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেই ভাল হয়।

পৃ. ১৪২, পংক্তি ২৪, "শরীরকে" স্থলে "শরীরে" ছিল।

২৫, "অশ্বসঞ্চালন" স্থলে "অশ্বচালন" ছিল।